কৃষিশিক্ষা

অষ্টম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

Kwlwk¶v

Aóg †kwY

রচনা

প্রফেসর মুহম্মদ আশরাফউজ্জামান
প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেন ভূঞা
প্রফেসর মো. আনোয়ারুল হক বেগ
ড. কাজী আহসান হাবীব
আনোয়ারা খানম
খোন্দ. জুলফিকার হোসেন
এ কে এম মিজানুর রহমান

m¤úv`bv
প্রফেসর ড. মো. সদরুল আমিন

RvZxq wk¶vµg I cwV¨c¯—K †ewW, XvKv

RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW
69-70, gwZwSj ewYwR¨K GjvKv, XvKv-1000
KZK cKwkZ|

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২

cvV¨c¯ÍK **প্রণয়নে সমন্বয়ক**
শাহীনর বেগম
মোঃ দুলাল মিঞা ভূঞা

Kw¤úDUvi K‡¤úvR
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রা:) লি:

c"Q`
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
স্নিগ্ধ শেখর চিন্তাপত্র

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপ¯—ক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামল্যে বিতরণের জন্য

g`‡Y:

cm•M-K_v

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বোতমুখী উন্নয়নের cekZ| আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার cwicY বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক ¯—‡i অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে D"PZi শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ ¯—‡ii শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত cUfwgi প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক gj¨‡eva থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃ ùZ প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য ev¯—evq‡b শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক ¯—‡ii cvq mKj cvV¨c¯—K। উক্ত cvV¨c¯—K প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও ce অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। cvV¨c¯—K¸‡jvi বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে gj¨vqb‡K সৃজনশীল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ gjZ কৃষি-অর্থনীতি নির্ভর দেশ। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে সীমিত fwgi সর্বোত্তম ব্যবহার, অধিক ফসল ফলনের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং কৃষি বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার কৌশলের সাথে পরিচিত করার প্রয়াস নিয়ে cvV¨c¯ÍKwU প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে cvV¨c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। কাজেই cvV¨c¯ÍKwUi আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো MVbgjK ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। cvV¨c¯ÍK প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে c¯ÍKwU রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে cvV¨c¯ÍKwU‡K আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

cvV¨c¯ÍKwU iPbv, m¤úv`bv, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। cvV¨c¯ÍKwU শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

c‡dmi †gvt †gv¯—dv KvgvjDwÏb
†Pqvig¨vb
RvZxq wk¶vµg I cvV¨c¯—K †evW©, XvKv

mwPcÎ

Aa¨vq	Aa¨v‡qi wk‡ivbvg	côv
c_g	evsjv‡`‡ki Kwl I আন্তর্জাতিক †c¶vcU	1-12
wØZxq	Kwl chw³	13-34
ZZxq	Kwl DcKiY	35-51
PZ_	Kwl I Rjevq	52-66
cÂg	KwlR Drcv`b	67-100
lô	ebvqb	101-124

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশের কৃষি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। এই শিল্পায়নের যুগেও বাংলাদেশ কৃষির ওপর m¤úY নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক কৃষির সাথে Zjbv করলে অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। যেমন বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ আর আমরা মাছে-ভাতে বাঙালি হলেও ধান উৎপাদনে আমরা ভিয়েতনাম, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হতে অনেক পিছিয়ে আছি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানীরা প্রতিযোগিতাgলক অবস্থানে hv‡"Qন। একসময় বাংলাদেশে বিশ্বের ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদন হতো। কিন্তু ধানের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে পাটের উৎপাদন কৃষকরা কমিয়ে দিয়েছেন। তবুও পাট জাতীয় প্রভৃতিতে বেশী অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

বাংলাদেশের বাজারে শুধু যে বাংলাদেশের পণ্যই পাওয়া যায় তা নয়। প্রতিবেশী দেশের পণ্যও বাজারে প্রবেশ করেছে। এতে করে বাংলাদেশের সাথে অন্য দেশের একটি প্রতিযোগিতাgjK অবস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষির অবস্থা এ অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চিত্র : কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আধুনিক কৃষি ফলন এবং আমাদের জীবনধারার পরিবর্তনের মধ্যে m¤úK স্থাপন করতে পারব।
- বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির অগ্রগতির m¤ú‡K বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশের কৃষির সাথে কয়েকটি নির্বাচিত দেশের কৃষির Zjbv করতে পারব।

পাঠ- ১ : কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান

কৃষিতে বিজ্ঞানীদের অবদান অনেক। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত bZb bZb বিষয় কৃষির সাথে যুক্ত করে কৃষি কর্মকাণ্ডকে আধুনিকায়ন করেছেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা যেমন বিজ্ঞানী হতে পারেন তেমনি কৃষকরাও বিজ্ঞানী হতে পারেন। আদি কৃষির উৎপত্তি সাধারণ মানুষের হাতেই। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা জলবায়ু, পরিবেশ, মাটি, পানি উৎপাদন পদ্ধতি এসব বিষয় বিবেচনায় এনে D"PZi গবেষণা করছেন। তাদের নিরলস গবেষণার ফলে কৃষিতে যুক্ত n‡"Q bZb bZb প্রযুক্তি।

বাংলাদেশের কৃষি সমস্যাগুলোর দৃষ্টিগোচরে আনা জরুরি। এ দেশের প্রধান সমস্যাগুলো n‡"Q-

১। পুষ্টির সমস্যা

২। সার ব্যবস্থাপনা সমস্যা

৩। বন্যা ও খরা সমস্যা

৪। লবণাক্ততা সমস্যা

উপর্যুক্ত সমস্যাবলি সমাধানে বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। সারাদেশে পুষ্টি সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা দেশকে ত্রিশটি AÂ‡j ভাগ করেছেন। কোন AÂ‡ji মাটি wKic এসব বিষয় উদ্ভাবন কৃষিবিজ্ঞানীদের একটি PwÂj¨Ki অবদান। পরিবেশ AÂ‡ji মাটির ধরন বিবেচনা করে ফসল ফলানোর জন্য কোন ফসলে কী মাত্রায় প্রয়োগ করা হবে তা কৃষকের অনুমোদন দেওয়া হয়। তেমনিভাবে সার ব্যবস্থাপনায় সুন্দর পরামর্শ দেওয়া n‡"Q| ceeZx ফসলে যে মাত্রায় সার দেওয়া হয়েছে, কোন কোন সার নিঃশেষ হয়ে যায় না – এ অবস্থা বিবেচনা করে পরবর্তী ফসলের জন্য সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

বন্যা, খরা, লবণাক্ততা বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা। এ সমস্যা `ixKi‡Yi জন্য বিজ্ঞানীরা বেশ অগ্রসর হয়েছেন। যেমন বন্যার শেষে ধান চাষের জন্য বিলম্ব জাত হিসেবে ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট কিরণ ও দিশারি নামে দুটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। সম্প্রতি বন্যাকবলিত এলাকার জন্য ব্রি ধান-৫১ ও ব্রি ধান-৫২ নামে আরও দুটি জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। এই জাতের ধান দুটি পানির নিচে ১০-১৫ দিন টিকে থাকতে পারে। কৃষিতে একটি Ace অবদান।

বন্যা যেমন কৃষকদের একটি বড় সমস্যা, খরা ও লবণাক্ততা আরও বড় সমস্যা। এজন্য বিজ্ঞানীরা ব্রি-৫৬ নামের ধান উদ্ভাবন করেছেন। উপকূল AÂ‡ji লবণাক্ততার সমস্যা `i করার জন্য ব্রি ধান-৪৫ ও ব্রি ধান-৪৭ উদ্ভাবন হয়েছে।

অভিজ্ঞার মধ্য দিয়ে কৃষকেরা bZb বিষয় আবিষ্কার করে কৃষিতে bZb মাত্রা যোগ করেছেন। যেমন ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালি হরিধান নামে একটি ধান নির্বাচন করেছেন। উদ্ভিদের উপযুক্ত অঙ্গ বীজ হিসেবে ব্যবহার করা n‡"Q| এইরূপ বীজের একটি বাড়তি সুবিধা বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন। এই ধরনের প্রজননের মাতৃগাছের সকল গুণাগুণ হুবহু পাওয়া যায়। ফুলের পরাগায়ণের সময় পিতৃগাছের গুণাগুন যুক্ত হওয়ার সুযোগ জীবতাত্ত্বিক বীজে থাকে অঙ্গজ প্রজননে সে আশঙ্কা থাকে না। অঙ্গজ প্রজননে কৃষকরা ব্যবহার করে থাকেন কলা, আম, লিচু, কমলা, গোলাপ ইত্যাদি। ফসলের বীজ উন্নয়ন, নতুন নতুন প্রজাতি উন্নয়ন, বীজ সংরক্ষণ, রোগ-বালাইয়ের কারণ, শনাক্তকরণ ও উপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ, ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে আনা,

ফসলের পুষ্টিমান বাড়ানো, এমনকি ফসল সংগ্রহের পর তা বিপণনের মাধ্যমে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত ফসলের নিরাপত্তা বিধান ও স্বাস্থ্যm¤§Z রাখার যাবতীয় প্রযুক্তি কৃষি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীর গবেষণা সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে m¤úb হয়।

কৃষির সঙ্গে বিজ্ঞানের নানা শাখার কর্মকাণ্ড জড়িত। কৃষিতত্ত্ব ছাড়াও মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উদ্যানতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কৃষিযন্ত্র ও শক্তি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি শাখার বিজ্ঞানীরা তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে অবদান রাখছেন। পশুপাখি পালন ও এদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অপর একদল বিজ্ঞানী ক্রমাগত কাজ করছেন। মৎস্য লালন পালন প্রজনন, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রেও আরও GK`j বিজ্ঞানী অবদান রাখছেন। এই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বিভিন্ন গবেষণা ইন্সটিটিউট বিভিন্ন উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশেও রয়েছে। এসব ইন্সটিটিউট ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা কৃষির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন।

কাজ :

শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে, একজন কৃষিবিজ্ঞানী ও তাঁর অবদান m¤ú‡K আলোচনা করে পোস্টারে লিখবে এবং উপ¯'vপন করবে।

পাঠ- ২ : বাংলাদেশের জনমানুষের জীবন, সংস্কৃতি এবং কৃষির আধুনিকায়ন

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার সচনা প্রাচীনকালেই হয়েছিল। এ সময় সাধারণ অভাব অনটন ওপর ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রাস করেছিল, সময়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাল। জাপানি সেনাদের হাতে পড়ার ভয়ে বৃটিশ সরকার পোড়ামাটি নীতির অধীনে বাংলা ও আসামের খাদ্যগুদামের খাদ্যশস্য হয় পশ্চিমে স্থানান্তর করেছিল, নয় ধ্বংস করেছিল। দুর্বিষহ দুর্ভিক্ষে শুধু ce বাংলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়। মহাযুদ্ধে দুর্বল হয়ে পরলেও ঐ সময় বৃটিশ সরকার একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেয়। আসাম ও বাংলার জন্য ঢাকার শেরে বাংলা নগরে একটি কৃষি ইন্সটিটিউট, কুমিল্লায় একটি ভেটেরিনারি কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অনুষদ খুলে ডিগ্রি পর্যায়ের কৃষি শিক্ষা চালুর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি কৃষি বিভাগ নামে একটি বিশেষায়িত দপ্তর চালু করা হয়। এতে তাৎক্ষণিকভাবে দুর্ভিক্ষাবস্থার উন্নতি না হলেও বাংলাদেশের কৃষির আধুনিকায়নের যাত্রা শুরু হয়। cwK¯Ívb আমলে ১৯৬১ সালে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এঁদের নির্দেশনায় ZYgj পর্যায়ে কাজ করার দক্ষ মাঠ কর্মী তৈরি করতে কিছু কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও পশু চিকিৎসা ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (AETI & VTI) স্থাপন করা হয়। প্রায় প্রতিটি জেলায় সরকারি কৃষি ফার্ম, পোল্ট্রি ফার্ম এবং কোথাও কোথাও ডেইরি ফার্ম চালু হয় প্রদর্শনী খামার হিসাবে। পাট, আখ, চা ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের বিষয়ে গবেষণার জন্য একক গবেষণা ইন্সটিটিউট যথাক্রমে ঢাকা ঈশ্বরদি ও শ্রীমঙ্গালে স্থাপিত হয়। গাজীপুরে পাশাপাশি কৃষি গবেষণা ও ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়।

এই সকল আয়োজনের ফলে ce বাংলায় কৃষির আধুনিকায়ন শুরু হয় গত শতকের ষাটের দশকে। প্রধান কৃষি ফসল ধানের ক্ষেত্রে এর প্রভাব সবচাইতে বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন স্বাদগন্ধের কিন্তু কম ফলনশীল স্থানীয় ধান জাত গুলোকে ক্ষেত থেকে হটিয়ে দেয় ZjbvgjK D"P ফলনশীল ইরি-ব্রি জাতগুলো। এগুলো চাষের জন্য সার, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির চাহিদা কৃষিতে বাড়তে থাকে। ফলে উৎপাদন ব্যয়

ক্রমাগত বাড়তে থাকে। পুঁজিহীন দরিদ্র কৃষকেরা হয় ক্ষেতমজুরে পরিণত হন না হয় ভিটেমাটি ছেড়ে শহরে পাড়ি জমান নতুন পেশার খোঁজে। এ সময় উন্নত জাতের মুরগি, হাঁস ও গরুরখামার আবার কিছু গ্রামীণ কর্মসংস্থান করে দেয়। পরিবহন ও বিপণনের সুবিধার জন্য দেশের শহরগুলো ঘিরে আধুনিক মুরগি খামার দিন দিন বেড়ে চলে।

কৃষিতে বিভিন্ন ফসলের D"PZi ফলন, পশুজাত দ্রব্যাদি তথা ডিম, দুধ, মাংস চামড়ার U"P ফলন ও আয়বৃদ্ধি গ্রামীণ জীবনে শিক্ষার we¯Ívi NUvq এবং এক দিকে মধ্যবিত্ত পেশাজীবী ও অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণি দ্রুতই বাড়তে থাকে।

গ্রামীণ সংস্কৃতির উপরিকাঠামোতেও বাংলা ভাষার জয় এবং কৃষিসহ বিভিন্ন পেশার বিকাশ, পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন আনে ও বাঙালি জাতীয়তাবোধ প্রবল হয়। জারি-সারি-ভাটিয়ালি চর্চার পাশাপাশি কৃষক, শ্রমিক মধ্যবিত্তের মনোজগতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, লালন, হাসন রাজা, সুকান্ত ব্যাপক প্রভাব ফেলতে থাকেন। কৃষকের সাংস্কৃতিক জীবন ও জনমানুষের সাংস্কৃতিক ভাবনায় চমৎকার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে চারণ কবি খনার নানা মন্তব্য 'খনার বচন' নামে খ্যাত।

যেহেতু মাটি বা জমি হলো কৃষির gj ক্ষেত্র, এই মাটি নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। মাটির গঠন, প্রকারভেদ মাটির উর্বরতা, মাটিতে বসবাসকারী অনুজীব ও এদের উপকারিতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা যে তথ্য আবিষ্কার করেন কৃষিতে তার অবদান Agj¨| ফসল উদ্ভিদ, গবাদি পশুপাখি, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজনন, নিরাময় ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই বিজ্ঞানীদের D™wZ প্রযুক্তিগুলো কৃষকরা গ্রহণ করেছে ফলে স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্য উৎপাদনে কৃষির অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশগতিবিজ্ঞান আজ কৃষিতে ব্যাপক সাফল্য এনে দিয়েছে। U"P ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা, যব এই শস্যের উৎপাদনশীলতা আগের তুলনায় অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশের চারটি cYাঙ্গা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চালু রয়েছে, আছে একটি cYাঙ্গা ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রায় সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞানে পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষকগণ গবেষণা করে থাকেন। গবেষণার ফলাফল উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি m¤ú‡K সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীরা কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেন। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদনে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত n‡"Q|

ধানের ক্ষেত্রে এমন একটি ফলন বিপব ইতোমধ্যেই আমাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে। 'হাইব্রিড রাইস' নামে এক ধরনের ধানের কথা শুনেছি। নিয়ম কানুন মেনে চাষ করলে প্রচলিত U"P ফলনশীল ধানের চেয়েও এই ধান বেশি ফলন দেয়।

বিজ্ঞানীরা এমন অনেক ফুল, ফল, শাক-সবজি, মুরগি, গরু, মাছ, বৃক্ষ ইত্যাদি বিদেশ থেকে এনে এদেশের কৃষিতে সংযোজন করেছেন, এগুলোর সাথে সংকরায়ণ করে নতুন দেশীয় পরিবেশ সহনীয় ও পরিবেশ বান্ধব জাতের উদ্ভাবন করেছেন ও করছেন যেগুলো এ দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে hv‡"Q প্রতি বছর।

কৃষি উৎপাদনের এই অগ্রগতি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন এনেছে। কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। উৎপাদন বৈচিত্র্য বাড়ছে সেই সাথে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে। একই সাথে বাড়ছে পুঁজির ব্যবহার। মাছ, মুরগি ও ডিম উৎপাদন প্রায় শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের চাহিদা গ্রামীণ জনজীবনে দ্রুতই বেড়ে চলেছে।

কাজ :

শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকায়ন আমাদের জীবনধারার কী পরিবর্তন এনেছে তা ব্যক্ত করবে।

পাঠ-৩ : বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষির অগ্রগতি

আজকাল বিশ্বের দেশগুলোকে উন্নত ও অনুন্নত দেশ হিসাবে ভাগ করা হয়। এই দেশগুলোকেই আবার শিল্পোন্নত ও কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে পরিচিত করা হয়।

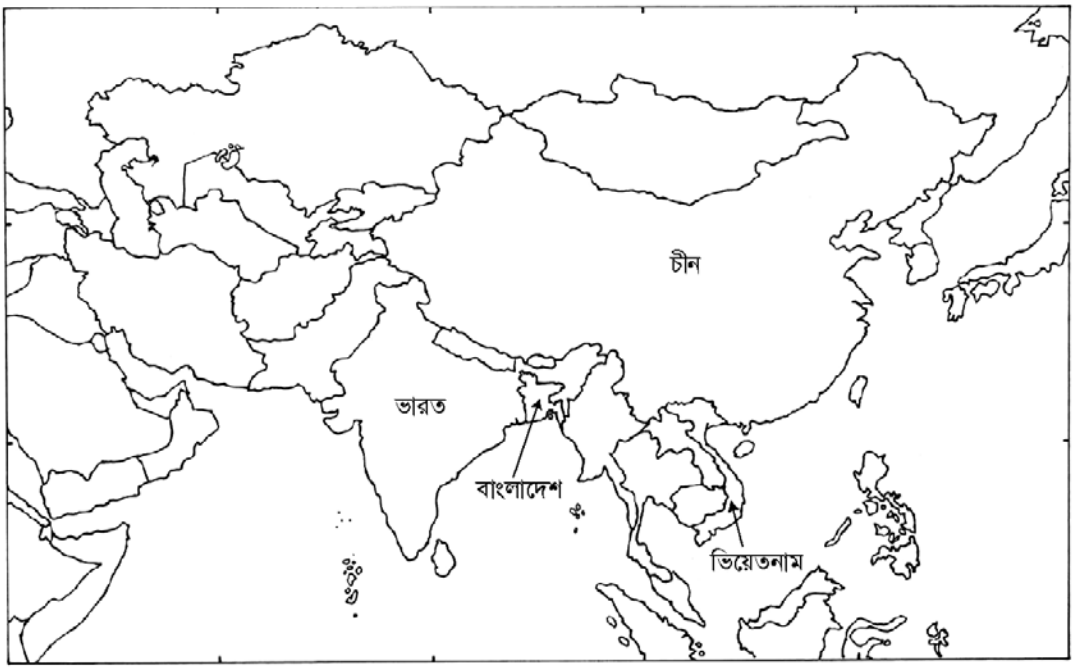

চিত্র : এশিয়ার মানচিত্র (বাংলাদেশ, ভারত ,চীন, ভিয়েতনাম)

শিল্পোন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত। এ সকল দেশ তাদের দেশের কৃষিকে তথা কৃষি প্রযুক্তির এতটাই উন্নয়ন ঘটিয়েছে যে, তা প্রায় শিল্পে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে যে সকল দেশের অর্থনীতি 'কৃষিনির্ভর' রয়ে গেছে সে সকল দেশের সরকার বা কৃষক সমাজ শুধু অর্থনৈতিক কারণেই উন্নত কৃষি প্রযুক্তি আত্মস্থ ও ব্যবহার করতে পারছে না, ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন এমন মাত্রায় করতে পারছে না, যা শিল্পোন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। ফলে দারিদ্র্যের একটা দুষ্টচক্রে ঘুরপাক L\‡"Q কৃষিপ্রধান 'উন্নয়নশীল' 'স্বল্পোন্নত' এই দেশগুলো। আসল কথা n‡"Q আজ অনুন্নত দেশগুলো কৃষিতে অনুন্নত এবং উন্নত দেশগুলো কৃষিতেও উন্নত।

স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষির অগ্রগতি : স্বাধীন বাংলাদেশের যাত্রাকালে দেশে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি কৃষি কলেজ, একটি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কয়েকটি কৃষি সম্প্রসারণ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ছিল। এখন চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু আছে, এর পাশাপাশি প্রায় সকল বিজ্ঞান

ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও পশুপালন অনুষদ চালু আছে। বর্তমানে সকল কৃষি ফসলের জন্য বিশেষায়িত গবেষণাগার রয়েছে। প্রতি বছর শহর ও MvgvÂ‡j কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত n‡"Q| কৃষিকে অধিকতর পরিবেশ বান্ধব করার জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা IPM সহ উত্তম কৃষি কার্যক্রমে কৃষকদের উৎসাহিত ও দক্ষ করে তোলার বিবিধ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। কৃত্রিম রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য সবুজ সার, K‡¤úv÷ তৈরি ও ক্ষেতে প্রয়োগ, কেঁচো জাত সার বা fvgK‡¤úv÷ প্রয়োগ প্রযুক্তিগুলো কৃষকদের হাতে পৌঁছানো n‡"Q| গবাদি পশুর খাদ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য উন্নত গো খাদ্য ও ঘাস উৎপাদন, ঘাস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সাইলো তৈরি, পোল্ট্রি ও মৎস্য খাদ্য তৈরিতে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। দেশে পোল্ট্রি একটি কৃষি শিল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাজারে মাছের একটা বড় অংশ এখন আসছে চাষকৃত মাছ থেকে। প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ সরকারিভাবে উৎসাহিত করায় কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়নের দিকে কৃষক আকৃষ্ট n‡"Qb| কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়েছে। বায়ো টেকনোলজি বা জীবকৌশল বিজ্ঞানে অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিতে bZb সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশি বিজ্ঞানী কর্তৃক পাটের জেনেটিক ম্যাপ আবিষ্কার একটি উলেখযোগ্য ঘটনা। অর্থাৎ বাংলাদেশে কৃষির আধুনিক যুগের mPbv হয়েছে।

ভারতের কৃষি : ভারত একটি বৃহৎ দেশ। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দেশও বটে। ভারতের কিছু মরু AÂj ছাড়া সমগ্র পার্বত্য ও সমতল AÂjB কৃষিপ্রধান। কৃষি পরিবেশেও দেশটি বৈচিত্র্যময়। ফলে শস্য, ফুল, ফল, সবজি, মাংস, দুধ, ডিম এমন কোনো কৃষিজ পণ্য প্রায় নেই যা ভারতে উৎপন্ন হয় না এবং বাজারে পাওয়া যায় না। ভারতের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শুধু ভারতের কৃষি ব্যবস্থার কাজে লাগছে না, বিশ্বও উপকৃত হ"Q। ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের অন্যতম আমদানিকারক বাংলাদেশ।

চীনের কৃষি : সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সুবিধাগুলো চীনের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে খুবই সহায়ক fvgKv পালন করেছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার দেশ হলেও চীনে খাদ্য ঘাটতির কথা শোনা যায় না। প্রতি হেক্টরে m‡ev"P পরিমাণ ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষমতা চীনা কৃষক ও বিজ্ঞানীদের কবজায় রয়েছে। আমাদের দেশে সদ্য প্রযুক্ত হাইব্রিড ধান বীজের একটা বড় জোগানদার চীন। চীনা প্রযুক্তি শেখা ও আমাদের মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভিয়েতনামের কৃষি : ভিয়েতনামের অগ্রগতিতে তাদের কৃষক সমাজ ও কৃষির অবদান বিরাট। বিশেষ করে বিশ্বের অন্যতম প্রধান চাল রপ্তানিকারক দেশ আজ ভিয়েতনাম। কৃষি প্রযুক্তি বিকাশে গত কয়েক বছরে এঁদের সাফল্য we¯‹qKi| ওদের কাছে আমাদের শেখার রয়েছে অনেক। কৃষির উন্নয়নের বিষয়টি দেশ বা AÂ‡ji সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে যে প্রতিষ্ঠান বিশ্বজুড়ে কাজ করে তার নাম "খাদ্য ও কৃষি সংগঠন" (Food and Agricultural Organization, FAO)। এ ছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (International Rice Research Institue, IRRI, Phillipines), এর মতো বিশেষ ফসলভিত্তিক গবেষণা cwZôvbmgn| আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুতcY fvgKv পালন করে চলেছে।

শ্রেণির কাজ

১. শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে 'বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতি' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ খাতায় লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

বাড়ির কাজ

১. শিক্ষার্থীরা কৃষির পত্তন যে নারীর হাতে হয়েছিল এমন প্রত্যয়ের কারণ বা যুক্তিগুলো লিখবে এবং শ্রেণিতে জমা দেবে।

২. কৃষির আধুনিকায়ন আমাদের জীবনযাত্রায় কীভাবে প্রভাব ফেলছে তার একটি বর্ণনা লিখে শ্রেণিতে জমা দেবে।

এশীয় ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষির প্রধান ফলন, মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা।

পাঠ-৪ : এশীয় ও বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কৃষির তুলনা।

বাংলাদেশ, ভারত, চীন ও ভিয়েতনাম চারটি দেশ এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। এই দেশগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক কারণেই যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। চারটি দেশের প্রধান উৎপাদন হচ্ছে ধান। চারটি দেশের জনগণ প্রধানত ভাত খেয়ে বাঁচে। এদের মধ্যে চীন ভারত ও বাংলাদেশ অত্যন্ত জনবহুল দেশ। অবশ্য ভিয়েতনাম ততটা নয়।

বাংলাদেশ ও চীন

বাংলাদেশের তুলনায় চীন কৃষিতে অনেক উন্নত দেশ। ফসলওয়ারি তুলনা করলে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সকল কৃষিজাত উৎপাদন হেক্টর প্রতি চীনে বেশি। এর প্রধান দুটি কারণ আছে। এক জিনগত অর্থাৎ বংশগতি গত পরিবর্তন এমনভাবে তারা ঘটাতে সক্ষম হয়েছে যে তাদের অধিকাংশ ধানের জাত মৌসুম নির্ভরশীল আর নেই, এই জাতগুলো আগে প্রচলিত জাতগুলোর চাইতে হেক্টর প্রতি সাতগুণ পর্যন্ত ফলন দিচ্ছে। চীনের ধান গবেষকগণ দাবি করছেন আগামী প্রজন্মের ধান জাতগুলো এখনকার চাইতে দ্বিগুণ উৎপাদন দেবে। এই 'সুপার হাইব্রিড ধানের একটি বড় ধরনের অসুবিধা তো ইতোমধ্যে চিন্তার কারণ হয়েছে, তা হলো এই সকল অত্যাধুনিক ধানের বীজ রাখা যায় না। এক প্রজন্মেই বীজের গুণাগুণ শেষ। চীনের বর্তমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই সব ফসল হয়ত বা সহায়ক ও হুমকিহীন। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। কারণ ঐতিহ্যগতভাবে ধানবীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের বীজ ব্যবসায়ীদের মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকলেও চলে। কেননা দেশের মোট ব্যবহৃত ধানবীজের অন্তত ৮৫% চাষিরা নিজেরাই রাখে ও ব্যবহার করে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (BRRI) এ পর্যন্ত যতগুলো নতুন ফলনশীল ধান জাত (HYV) উদ্ভাবন করে কৃষকের হাতে তুলে দিয়েছে সেগুলোর বীজ ধানক্ষেতেই উৎপাদন করা যায় এবং চাষিরা পরবর্তী ফসলের জন্য বীজ সেখান থেকে রাখে করে রাখতে পারেন। অর্থাৎ ধানবীজের জন্য বাংলাদেশের চাষিদের এক ধরনের সার্বভৌমত্ব রয়েছে। অবশ্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটে ও ঐ টার্মিনেটর টাইপ সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের জন্য জোর গবেষণা চলছে। শীঘ্রই হয়ত বাংলাদেশের চাষিরা এই অতি নতুন ফলনশীল দেশি ধান বীজ পাবে চাষ করার জন্য। তবে এই ধান উৎপাদনের অভিজ্ঞতা

ইতোমধ্যেই অনেক বাংলাদেশি চাষির হয়েছে কারণ কয়েকটি বীজ ব্যবসায়ী †Kv¤úvwb এ ধরনের ধানের বীজ বাংলাদেশে চালু করতে আগ্রহী ছিল এবং সরকার civ¶vgjKfv‡e সীমিত আকারে এ জাতীয় ধান উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছিল এই শর্তে যে, †Kv¤úvwb¸‡jv দেশেই এই ধানবীজ উৎপাদন করবে।

পাঠ- ৫ : বাংলাদেশ ও ভারত

আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। এ দেশের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক m¤úK রয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রে এই যোগাযোগ দুই দেশেরই ঐতিহ্যের অঙ্গ। দুটি দেশই জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির দ্বারা সমস্যাগ্র¯Í। এই বিপুল, দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিবারণের গুরুভার দেশ দুটির কৃষক সমাজের ওপর b¨¯Í| যারা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, তদুপরি, ঐ দুর্বলতার কারণেই, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণে মোটামুটি সীমাবদ্ধ সামর্থ্যবান।

কিন্তু এ সত্ত্বেও ভারতের কৃষি বাংলাদেশের চাইতে অনেক অগ্রসর। ধানসহ অন্যান্য শস্য, ডাল ফসল, ফুল ফল শাক সবজি, ভোজ্য তেলবীজ, তুলা, আখ ইত্যাদি মাঠ ও উদ্যান ফসল, পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, অর্থাৎ প্রায় সকল কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারত বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে। ভারতে রয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ডেইরি সমবায় প্রতিষ্ঠান-যা বাকি বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় উদাহরণ। একই ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশীদার হওয়ার পরও গত ষাট-সত্তর বছরে এই ব্যতিক্রমী পরিবর্তনের ধারা চলেছে। এর প্রধান দুটি কারণের একটি হলো এই যে ভারতের কৃষক বাংলাদেশের কৃষকদের চাইতে অনেক সংগঠিত; আর অপর প্রধান কারণ হলো কৃষিবিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ভারতে AfZce অগ্রগতি। ভারতীয় বিজ্ঞানীরা শুধু ভারতের কৃষিকেই নয় বিশ্বের কৃষিকেও নেতৃত্ব দি"Qন। অবশ্য ভারতে কাজের ক্ষেত্রও সুবিশাল।

বাংলাদেশের প্রায় cÂvk¸Y বড় এই দেশটিতে কৃষি পরিবেশের বৈচিত্র্য একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ অপরদিকে ততোটাই সম্ভবনাময়। মরু AÂj থেকে শুরু করে বরফাবৃত AÂj, wbP Rjvfwg থেকে শুরু করে পার্বত্য অসমতল fwg, অনুর্বর খরাপ্রবণ এলাকা থেকে নদীবিধৌত উর্বর AÂjI i‡q‡Q। দেশের এক A¼‡j যখন তুষারস্নাত শীতকাল অন্য A¼‡j তখন গ্রীষ্ম বা বসন্তকাল। এমন কোনো মাঠ বা উদ্যান ফসলের নাম করা কঠিন হবে যা ভারতের কোথাও না কোথাও জন্মা"Q। তাছাড়া রয়েছে উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য। এক কথায় বলা যায় বৈচিত্র্যcY দেশ ভারত।

এত কিছুর পরও প্রায় সকল ফসলের, ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশে জমির ইউনিট প্রতি উৎপাদন গড় কাছাকাছি। আবার ভারতের কিছু কিছু রাজ্য রয়েছে, যেমন পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা কেরালা, যেখানে ইউনিট প্রতি উৎপাদন অনেক DP|

পাট, চামড়া, ইলিশ ইত্যাদি কিছু পণ্য ছাড়া প্রায় সব কৃষিপণ্য ভারত থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম

বাংলাদেশের ও ভিয়েতনাম কৃষিতে সবচাইতে বড় মিল ধান উৎপাদন। তবে এক্ষেত্রে দৃশ্যত ভিয়েতনামের কৃষকদের অগ্রগতি বাংলাদেশের চাই দ্রুত। পঁচিশ বৎসর আগে যেখানে ভিয়েতনামের কৃষি উৎপাদন অনগ্রসর ও দুর্বল ছিল। এখন ভিয়েতনাম কৃষিজ উৎপাদনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেছে। এই গতি পাওয়ার প্রধানতম কারণ হলো ভিয়েতনামের কৃষক সমাজ অত্যন্ত সংগঠিত। ভিয়েতনামের কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী ও সৃজনশীল। ভিয়েতনামে এমন কৃষক খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি কোনো না কোনো সমবায় সংগঠনের সদস্য নন। কৃষি সমবায় সংগঠনগুলো এতো শক্তিশালী যে এরা স্থানীয় সরকারের বাৎসরিক ব্যয়ের অন্তত ৫০% যোগান দিয়ে থাকে এবং স্থানীয় কৃষি গবেষণা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিষ্ঠানগুলোকেও আর্থিক সহায়তা যেমন দেয় তেমন এই সকল সংস্থার নীতি ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে fwgKv রাখে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ভিয়েতনাম থেকে বেশ কিছু মাঠ প্রযুক্তি আত্তীকৃত হয়েছে।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে বাংলাদেশের কৃষির অগ্রগতির সাথে এশীয় অন্য একটি দেশের কৃষির অগ্রগতির তুলনা সম্পর্কে পোস্টার পেপারে চার্ট আকারে লিখবে এবং উপস্থাপন করবে।

পাঠ- ৬ : ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা

ফসলের ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা মৌসুম নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ। এই দিবা দৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা `i করতে বা কমিয়ে দিতে পারলে অর্থাৎ একটি মৌসুম নির্ভর ফসলকে মৌসুম নির্ভরতা মুক্ত করতে পারলে ফসলটি যেকোনো মৌসুমে উৎপাদন করা যায়।

উপযোগিতা :

১। বাজারে অসময়ের ফল ও সবজির চাহিদা খুবই বেশি। এসব অসময়ের ফসল উ"Pমল্যে বিক্রি হয়। কৃষক ও খুচরা বিক্রেতা উভয়ে বাড়তি পয়সা উপার্জন করতে পারে।

২। বিশেষ করে আগাম ফসল বাজারজাত করতে পারলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

৩। ঋতুচক্র সংশিষ্ট কর্মহীনতা `i হয়ে কৃষককে মোটামুটি সারা বছর কর্ম e¨¯Í রাখতে পারে।

৪। একই কারণে গ্রামীণ কর্মশক্তিকে সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

৫। 'মঙ্গা' বা এই ধরনের সাময়িক দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

৬। বাজারে কৃষিপণ্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করতে পারে।

৭। পুষ্টি সমস্যার সমাধান সহজতর করতে পারে।

৮। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হতে পারে।

৯। বিদেশি ক্রেতাদের সারা বছর কৃষিপণ্যের লভ্যতার নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ফলে কৃষিপণ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো যায়।

১০। কৃষি গবেষণাকে মৌসুম নির্ভরতামুক্ত করা যায়।

ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার বিভিন্ন কৌশল

১। ফসল উৎপাদনের কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি : ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ পরিবর্তন না করেই এই কৌশলে যে কোনো ফসল উৎপাদন করা যায়। এ ক্ষেত্রে উন্মুক্ত মাঠে বা উদ্যানে কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদন না করে গ্রিন হাউজে তা উৎপাদন করা হয়। অর্থাৎ বন্ধ ঘরে কৃত্রিম উপায়ে ঐ ফসলের উপযুক্ত দিবস, দৈর্ঘ্য,

চিত্র : গ্রিন হাউজ

পর্যাপ্ত আলো, উত্তাপ, বায়ুর আর্দ্রতাসহ পরিবেশগত যাবতীয় উপাদান m¤úY নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। অপরদিকে প্রত্যেক উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুষম পুষ্টি সরবরাহ করার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। এই কৌশল e¯Íevq‡bi প্রাথমিক cekZ হলো ফসলের পরিবেশ ও পুষ্টি m¤ú‡K we¯ÍwiZ এবং পরীক্ষিত তথ্যাদি। দ্বিতীয় শর্ত হলো প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও পুষ্টি সরবরাহের নিখুঁত যান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপন ও পরিচালনা। তৃতীয় গুরুত্বcY শর্ত হলো wbiew"Qb শক্তির (বিদ্যুৎ) নিশ্চিত প্রবাহ। নিখুঁত আয়োজন ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে পারলে প্রায় যে কোনো উদ্যান ফসল এই কৌশল অবলম্বনে সম্ভব হলেও অতিমাত্রায় যন্ত্রনির্ভর এই পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেশি। দামি বিশেষ বিশেষ ফসল ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় না। এই কৌশলে যৌক্তিক কারণেই বিপুল পরিমাণে কোনো ফসল উৎপাদন করা যায় না।

তাছাড়া এই বিশেষ কৌশল নির্ভর উৎপাদন আয়োজন m¤úb করে এই আয়োজন অলস বসিয়ে রাখায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু নিশ্চিত লাভজনক বাজার পেলে (চুক্তির ভিত্তিতে) প্রক্রিয়া নিরব"Qন্ন চালু রাখতে পারলে ক্রমশ উৎপাদন ব্যয় কমে আসতে পারে। m¤úY নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলে ফসলকে রোগবালাই থেকে রক্ষা করার খাতে ব্যয় প্রায় নেই। ফসলও হয় m¤úY স্বাস্থ্যসম্মত।

আমাদের দেশে cix¶vgjKfv‡e এই পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম (মিষ্টি মরিচ), স্ট্রবেরি ও টমেটো উৎপাদন করা হয়েছে এবং দেখা গেছে যে লাভজনকভাবে এই ধরনের বিশেষ ফসল এই কৌশল ব্যবহার করে করা যায়। বর্তমানে এই ফসলগুলোর evRvigj¨ যথেষ্ট D"P|

২। ফসলের জেনেটিক বা বংশগতির পরিবর্তন : ফসলের মৌসুম নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার প্রায় স্থায়ী এবং ZjbvgjK কম ব্যয়বহুল পদ্ধতি হলো ফসলের বংশগতিতে পরিবর্তন আনা। ফসলের জিনগত বিন্যাস বদলানো, ফসলের দিবাদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতার জন্য দায়ী জিন ছাঁটাই করা অথবা এমন পরিবর্তন আনা যাতে তা প্রশমিত থাকে। সংকরায়ণ ও ক্রমাগত নির্বাচনের মাধ্যম ছাড়াও আরও বেশ কিছু আধুনিক উপায়ে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। এই ধরনের ফসলকে জিএম ফসল বা জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ বলা যেতে পারে এবং এই বিশেষ †Kvkjmgn‡K সাধারণভাবে বলা যায়া জীব-কৌশল বা বায়োটেকনোলজি।

৩। অভিজ্ঞ কৃষকের পর্যবেক্ষণ, চয়ন ও নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও মৌসুম নির্ভরতা এড়াতে সক্ষম লাইন শনাক্ত ও উন্নয়ন করা যেতে পারে। এগুলো মাঠ পর্যায়ে টিকে গেলে নতুন জাত (ভ্যারাইটি/কালটিভার) হিসাবে স্বীকৃতিও পেতে পারে। কৃষক পর্যায়ের আবিষ্কৃত এই সব আগাম জাত, নাবি জাত মাঠ পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে জনপ্রিয় কোনো কৃষিপণ্যের বাজারে দীর্ঘকাল লভ্য করা যায়। এই সকল কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যয়

খুব বেশি না হওয়ায় কৃষকের মুনাফা বাড়ার ক্ষেত্রে বেশ অবদান রাখতে পারে। ফসলের জাত উদ্ভাবনে মানব সমাজের এটাই সবচাইতে সনাতন পদ্ধতি।

বাড়ির কাজ

শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ হিসাবে 'মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠে কী কী ধরনের ফসল চাষ করা সম্ভব' তার তালিকা তৈরি করে আনবে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ

১. বন্যা, খরা ..... বাংলাদেশের প্রধান কৃষি সমস্যা।

২. চারণ কবি খনার নানা মন্তব্য ..... নামে খ্যাত।

৩. শিল্পোন্নত দেশগুলো ..... উন্নত।

৪. ফসলের ক্ষেত্রে দিনের দৈর্ঘ্য সচেতনতা ..... নির্ভরশীলতার প্রধান কারণ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. দশের মোট ব্যবহৃত ধান বীজের শতকরা কত ভাগ চাষিরা নিজেরাই mÂq ও ব্যবহার করেন?

ক. ৬৫% খ. ৭৫%

গ. ৮৫% ঘ. ৯৫%

২. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠা গেলে-

i. বেকারত্ব `i হবে

ii. পণ্যের দাম পাওয়া যাবে

iii. বিভিন্ন রকমের ফসল পাওয়া যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রওশন আরা তাহার বসত বাড়ির বাগানে কয়েকটি ফল গাছের ডাল থেকে তৈরি কলম চারা ও শাক সবজির বীজ বপন করেন এবং ভালো ফলন পান। কিন্তু পরবর্তী বৎসর নিজের উৎপাদিত শাক সবজির বীজ থেকে সবজি চাষ করে ভালো ফলন পেলেন না।

৩. রওশন আরার লাগানো ফল গাছগুলো কী ধরনের গুণmu¤úb হবে?

ক. মাতৃগাছের মতো খ. পিতৃগাছের মতো

গ. মাতৃগাছ থেকে ভালো ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের মতো

৪. রওশন আরার পরবর্তী বছর সবজি চাষ করে ভালো ফলন না পাওয়ার কারণ?

ক. নিজের বাগান থেকে বীজ সংগ্রহ
খ. পরের বছর একই জমিতে সবজি চাষ
গ. মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকা
ঘ. মাতৃ ও পিতৃগাছের গুণাগুণ একত্রে হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১ কৃষিনির্ভর এনায়েতপুর গ্রামের চাষিরা মৌসুমভিত্তিক ফসল চাষ করেন। তাদের উঁচু জমিগুলো অনেক সময়ই খালি পড়ে থাকে। ফলে চাষিরা ঐ সময়ে বেকার বসে থাকেন। জমিতে ফসল না থাকা ও বেকারত্বের কারণে দিশেহারা কৃষকরা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলে কৃষি কর্মকর্তা চাষিদের মৌসুম নির্ভরতা মুক্ত বিভিন্ন ফসলের জাত চাষাবাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। ধানসহ বিভিন্ন শাক-সবজির মৌসুম নির্ভরতা মুক্ত ফসল চাষ করে এনায়েতপুরের চাষিরা বর্তমানে স্বাবলম্বী।

ক. জি এম ফসল কী?
খ. সুপার হাইব্রিড ধানের চাষ চাষিদের বীজের সাবভৌমত্ব নষ্ট করে ব্যাখ্যা কর।
গ. ফসল চাষে সফলতা পেতে এনায়েতপুরের চাষিরা যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে এনায়েতপুরের চাষিরা কীভাবে স্বাবলম্বী হয়েছিল- বিশেষণ কর।

২. কৃষক রফিক টেলিভিশনে ভিয়েতনামের কৃষির উপর একটি প্রতিবেদন দেখছিলেন। প্রতিবেদনে ভিয়েতনামের কৃষিতে ব্যবহৃত আধুনিক প্রযুক্তি, চাষাবাদের ধরন ও চাষিদের কার্যক্রমের চিত্র দেখানো হয়। এক পর্যায়ে উপস্থাপক বললেন বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারার কারণে পিছিয়ে আছে। রফিক টেলিভিশনের অনুষ্ঠান থেকে ভিয়েতনামের চাষিদের কার্যক্রম ШПমা‡K ধারণা লাভ করে তার এলাকায় চাষিদের সংগঠিত করেন।

ক. কৃষি কী?
খ. আদি কৃষি উৎপত্তি সাধারণত মানুষের হাতেই- ব্যাখ্যা কর।
গ. রফিক কীভাবে তার এলাকার কৃষকদের সংগঠিত করেন ব্যাখ্যা কর।
ঘ. বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে উপস্থাপকের মন্তব্যটি gj¨vqb Ki।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অঙ্গজ প্রজননে কৃষকগণ কী ব্যবহার করে থাকেন?
২. কৃষিতে কৃত্রিম রাসায়নিক সারের নির্ভরশীলতা কীভাবে কমানো যায়?
৩. বাংলাদেশের কোন কোন কৃষিপণ্য ভারতে রপ্তানি হয়?
৪. গ্রিন হাউজ কাকে বলে?

রচনামলক প্রশ্ন

১. ফসলের মৌসুম নির্ভরশীলতা কাটিয়ে ওঠার উপযোগিতা বর্ণনা কর।
২. ভারত ও বাংলাদেশের কৃষির Zjbvগj K আলোচনা কর।
৩. কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে ফসল উৎপাদন কৌশল বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃষি প্রযুক্তি

প্রযুক্তি উদ্ভাবন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন হওয়ার পর এর ব্যবহার কিছুদিন চলে। পরে এর চেয়েও আরও উন্নত প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়। মানুষ প্রয়োজন মোতাবেক এই উন্নত bZb প্রযুক্তি গ্রহণ করে। যেমন: সার একটি রাসায়নিক প্রযুক্তি। দীর্ঘদিন মানুষ গাছকে পুষ্টি সরবরাহের জন্য উন্নত সার ব্যবহার করে আসছে। এরূপ সব সময়ই bZb প্রযুক্তি পুরাতন প্রযুক্তির স্থান দখল করে।

চিত্র : ধান রোপণ

চিত্র : মুরগির চিকিৎসা

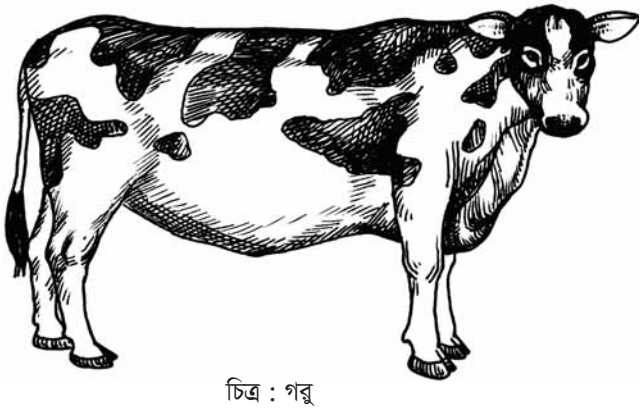

চিত্র : গরু

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

১। কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব

২। মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ ব্যাখ্যা করতে পারব

৩। শস্য পর্যায় ব্যাখ্যা করতে পারব

কৃষিতে বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার

পাঠ-১ : ধান চাষে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার

গুটি ইউরিয়ার পরিচয় : ধান চাষে অনেক সার ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে নাইট্রোজেন সম্বলিত ইউরিয়া প্রধান। দানাদার ইউরিয়া সারের সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য মেশিনের সাহায্যে এটাকে গুটি ইউরিয়ায় রূপান্তর করা হয়েছে।

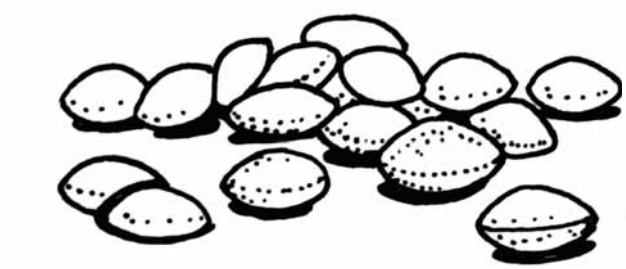

চিত্র : গুটি ইউরিয়া

চিত্র : দানাদার ইউরিয়া

গুটি ইউরিয়ার প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত দানাদার ইউরিয়া ব্যবহারের অসুবিধা থেকেই গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই এখানে প্রথমে প্রচলিত দানাদার ইউরিয়ার অসুবিধা আলোচনা করা হলো। পরে গুটি ইউরিয়া সারের সুবিধা তুলে ধরা হবে।

দানাদার ইউরিয়া সারের ব্যবহারের অসুবিধা :

১। দানাদার ইউরিয়া সার ॥K॥¯Í‡Z কয়েক বার প্রয়োগ করতে হয়।

২। এই সার পানিতে মিশে দ্রুত গলে এবং চুঁইয়ে মাটির নিচে গাছের ॥kKo-AÂ‡ji বাইরে চলে যায়।

৩। বৃষ্টি বা সেচের পানির সাথে এই সার সহজেই ক্ষেত হতে বের হয়ে যায়।

৪। এই সার ব্যবহারে বেশি অপচয় হয় এবং বেশি খরচ হয়।

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা :

১। গুটি ইউরিয়া ফসলের এক মৌসুমে একবার ব্যবহার করা হয়।

২। গুটি ইউরিয়ার ব্যবহারের ২০-৩০ ভাগ নাইট্রোজেনের সাশ্রয় হয়।

৩। গুটি ইউরিয়া ধীরে ধীরে গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে।

৪। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের ফলে ফলন ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

গুটি ইউরিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি

গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের পাঁচ থেকে সাত দিন c‡e ২০×২০ সে.মি. লাইন থেকে লাইন এবং চারা থেকে চারার `i‡Z ধানের চারা রোপণ করতে হবে। ধানের চারা রোপণের ৫-৭ দিনের মধ্যে মাটি শক্ত হওয়ার আগে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা জরুরি। জমিতে যখন ২-৩ সে.মি. পরিমাণ পানি থাকে সে সময় গুটি ইউরিয়া ব্যবহার সহজ হয়।

গুটি ইউরিয়ার ওজন বিভিন্ন রকমের হয়। যথা: ০.৯ গ্রাম, ১.৮ গ্রাম এবং ২.৭ গ্রাম। ওজন অনুযায়ী ধান ক্ষেতে ব্যবহারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ওজন যদি ০.৯ গ্রামের হয় তবে চারটি গুটির মাঝখানে বোরো ধানে ৩টি এবং আমন ও আউশে ২টি করে ব্যবহার করতে হবে। ওজন যদি ১.৮ গ্রাম হয় তবে বোরোতে ২টি এবং আমন-আউশে ১টি করে ব্যবহার করতে হবে। আবার ওজন যদি ২.৭ গ্রামের হয় তবে বোরোতে ১টি গুটি প্রয়োগই যথেষ্ট।

গুটি ইউরিয়া লাইনে চাষ করা ক্ষেতে প্রয়োগ করা সুবিধাজনক। প্রথম লাইনের প্রথম চার গোছার মাঝে ১০ সেমি. গভীরে গুটি ইউরিয়া পুঁতে দিতে হয়। এরপর চার গোছা বাদ দিয়ে পরবর্তী চার গোছার মাঝে একই গভীরতায় পুঁতে দিতে হবে। প্রথম লাইন শেষ করে দ্বিতীয় লাইনে, তৃতীয় লাইনে, চতুর্থ লাইনে গুটি ইউরিয়া পুঁতে দিতে হবে। এভাবে সমগ্র ক্ষেতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র : গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ

কাজ :

তোমাদের এক বিঘা ধানের জমি আছে। এ বছর তোমার বাবা লাইন পদ্ধতিতে ধান রোপণ করেছেন। তুমি নিজ হাতে তোমাদের ধানের জমিতে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ কর।

নতুন শব্দ : দানাদার ইউরিয়া, গুটি ইউরিয়া

পাঠ-২ : গরু মোটাতাজাকরণ

আমাদের দেশে ধানের ও শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও পশু সম্পদের উন্নতি তেমন হয়নি। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে পশু-m¤ú‡`র উন্নতি না হলে জনগণকে প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ করা যাবে না। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে ৮০'র দশকে মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্যতা ছিল মাত্র ১.৫৬ কেজি। কিন্তু এর আগের দশকে ছিল ১.৬৬ কেজি। এ থেকে বোঝা যা"Q আমিষ সরবরাহ দিন দিন কমে যা"Q। এর কারণ, গো-মাংসের সরবরাহ দিন দিন কমে যা"Q। এ সমস্যা `ixKi‡Yi লক্ষেই গরু-বাছুর মোটাতাজাকরণ এর প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অল্প সময়ে গরুকে মোটাতাজা করে অধিক g‡j¨ বাজারজাত করা হয় এবং অধিক লাভ পাওয়া যায়।

গরু মোটাতাজাকরণ পদ্ধতি :

মোটাতাজাকরণ পদ্ধতির উলেখযোগ্য বিষয় হলো :

১) **গরু নির্বাচন ও ক্রয় করা :** বলদ গরু মোটাতাজারণের জন্য ভালো। এ জন্যে দেড়-দুই বছর বয়সের এঁড়ে বাছুর ক্রয় করা উত্তম।

২) **বাসস্থান নির্মাণ :** প্রতিটি গরুর জন্য ১.৫ মি. × ২ মি. জায়গায় ঘর নির্মাণ করতে হবে।

৩) **রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা :** এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সংক্রামক রোগের টিকা দেওয়া জরুরি।

৪) **খাদ্য সরবরাহ :** পশুকে এমন খাদ্য দিতে হবে যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের পরিমাণ খাদ্যে বেশি থাকে।

মোটাতাজাকরণে খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া : পশু মোটাতাজাকরণ অর্থ হ"Q পরিমিত খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমে গরুর স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং মানুষের জন্য আমিষ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। খাদ্য থেকে পশু পুষ্টি পায় এবং শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। পশুকে এমন খাদ্য দিতে হবে যাতে আমিষ, শর্করা, চর্বি, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন সাধারণ খাদ্যের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণ থাকে। খড়-কুড়া, ভুট্টা বা গম ভাঙা, ঝোলাগুড় ইত্যাদিতে আমিষ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য থাকে। আর সবুজ কাঁচা ঘাস, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদিতে খনিজ লবণ ও ভিটামিন থাকে।

ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় মেশানো খাদ্য পশু মোটাতাজাকরণের সহায়ক। এগুলো দুইভাবে মিশিয়ে খাওয়ানো যায় (১) খড়ের সাথে মিশিয়ে এবং (২) দানাদার খাদ্যের সাথে মিশিয়ে।

খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরি :

১। প্রথমে একটি ডোল নিয়ে এর চারপাশ কাদা মিশিয়ে লেপে শুকিয়ে নিতে হবে।

২। এরপর একটি বালতিতে ২০ লিটার পানি নিতে হবে।

৩। এই পানিতে ১ কেজি ইউরিয়ার দ্রবণ তৈরি করতে হবে।

৪। ডোলের মধ্যে অল্প অল্প খড় দিয়ে ইউরিয়া দ্রবণ খড়ের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে চেপে চেপে ভরতে হবে।

৫। এভাবে m¤úY ডোল খড় দিয়ে ভরতে হবে।

৬। ডোলে খড় ভরা m¤úY হলে এর মুখ ছালা বা পলিথিন দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

৭। ১০ - ১২ দিন পর খড় বের করে রোদে শুকাতে হবে।

৮। এরপরই খড় গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হবে।

৯। সাধারণ একটি গরুকে প্রতিদিন ৩ কেজি ইউরিয়া মেশানো খড় খাওয়াতে হবে।

১০। খড়ের সাথে দৈনিক ৩০০-৪০০ গ্রাম ঝোলাগুড় মিশিয়ে দিতে হবে।

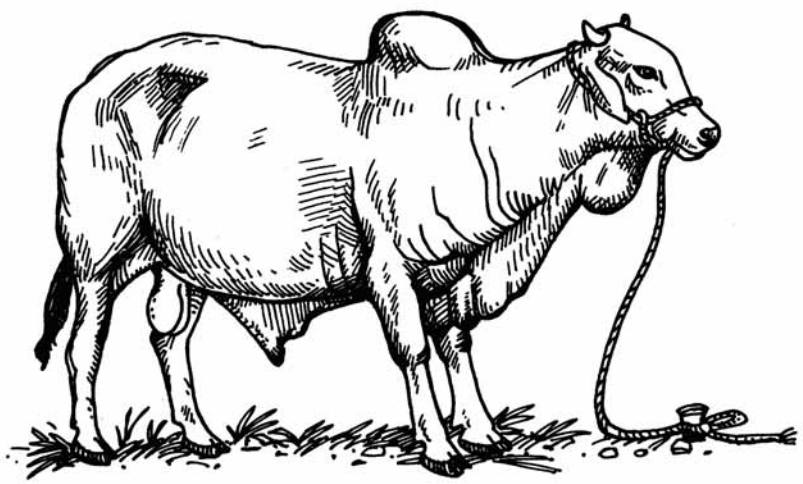

চিত্র : মোটাতাজা গরু

কাজ :

তোমাকে তোমার জন্মদিনে তোমার বাবা ২ বছর বয়সের একটি বাছুর উপহার দিয়েছেন। এটির স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়। Zvg গরুর বাছুর মোটাতাজা করার পরিকল্পনা তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপন কর।

bZb **শব্দ :** প্রাণী m¤ú`, গরু মোটাতাজাকরণ, ডোল, ঝোলাগুড়।

পাঠ- ৩ : ফসলের রোগ ও তার প্রতিকার

ফসলের রোগের ধারণা

আমরা কি জানি ফসলের রোগ হয়? আমরা হয়ত ভাবতে পারি মানুষের রোগ হয় পশু-পাখির রোগ হয় ফসলের আবার রোগ হয় নাকি? হ্যাঁ, ফসলেরও রোগ হয়। প্রত্যেক জীবেরই জীবন আছে, রোগ আছে আবার মরণও আছে। জীবের চারপাশে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াসহ আরও অনেক অণুজীব আছে যারা রোগ-বালাই ছড়ায়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা অণুজীব দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত মানুষ ও জীবজন্তুকে যেমন চিকিৎসা করে সুস্থ করা হয় তেমনি ফসলেরও চিকিৎসা করা হয় এবং নিরোগ করা হয়। অনেক সময় সুচিকিৎসা না হলে ফসল মরে যায়।

আমরা যদি ফসলের মাঠে যাই তবে অনেক রোগের লক্ষণ দেখতে পাব। দেখবো কোনো কোনো ফসলের পাতায় বা কাণ্ডে নানা প্রকার দাগ, কোনো কোনো ফসলের পাতায় ঘরের মেঝের মোজাইকের মতো হলুদ-সবুজ মেশানো ছোপ ছোপ রং। কোনো ফসলের শিকড় পচা আবার বীজতলায়ও দেখতে পাব অনেক ঢলে পড়া বা পচা চারা গাছ। এগুলো হ"Q গাছের রোগের লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখেই কৃষকেরা সতর্ক হন এবং প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন।

চিত্র : ফসলের রোগ

এখন আমরা নিশ্চয় জানতে চাইব ফসলের রোগ বলতে কী বোঝায়? যদি ফসলে শারীরিক কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেয়- যেমন ফসলের বাড়-বাড়তি ঠিকমতো হ"Q না, দেখতে দুর্বল ও লিকলিকে, ফুল অথবা ফল ঝরে যা"Q তখন বুঝতে হবে ফসলের কোনো না কোনো রোগ হয়েছে। নানা লক্ষণে ফসলের রোগ প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের ভিন্ন ভিন্ন রোগ হয়, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণও দেখা দেয়। নিচে কতকগুলো রোগাক্রান্ত ফসলের লক্ষণ উলেখ করা হলো।

১। **দাগ :** ফসলের পাতায়, কাণ্ডে বা ফলের গায়ে নানা ধরনের দাগ বা ¯úU দেখা দেয়। দাগের রং কালো, হালকা বাদামি, গাঢ় বাদামি কিংবা দেখতে পানিতে ভেজার মতো হয়। ফসলের এসব দাগ বিভিন্ন রোগের কারণে হয়। যেমন ধান গাছের বাদামি দাগ একটি ছত্রাকজনিত রোগের লক্ষণ।

২। **ধসা রোগ :** পাতা ঝলসে যায়। যেমন- ধান ও আলুর ধসা রোগ।

৩। **মোজাইক :** ফসলের পাতায় যখন গাঢ় ও হালকা হলদে-সবুজ এর ছোপ ছোপ রং দেখা যায় তখন এই লক্ষণকে মোজাইক বলা হয়। ঢেঁড়শে ও মুগে মোজাইক রোগ দেখা যায়। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগের লক্ষণ।

চিত্র : ঢেঁড়শের মোজাইক রোগ

৪। **ঢলে পড়া :** অনেক সময় ফসলের কাণ্ড ও শিকড় রোগে আক্রান্ত হলে ফসলের শাখাগুলো মাটির দিকে ঝুলে পড়ে। এই অবস্থাকে ঢলে পড়া বলে। যেমন, বেগুনের ঢলে পড়া রোগ।

চিত্র : বেগুনের ঢলে পড়া রোগ

৫। **পাতা কুঁকড়িয়ে যাওয়া :** ভাইরাসজনিত কারণে ফসলের পাতা কুঁক্ড়িয়ে যায়। পেঁপে, টমেটো এসব ফসলে পাতা কুঁক্ড়িয়ে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যায়।

প্রতিকার : ফসলের রোগের প্রতিকার রোগাক্রান্ত হওয়ার c‡e ব্যবস্থা নিতে হয়। কারণ, ফসল একবার রোগাক্রান্ত হয়ে গেলে প্রতিকার করা কঠিন। তাই রোগের cv` fve ঘটার আগে নিচে উলিখিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের জন্য বলা হলো।

১। **জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার করা :** বীজের মাধ্যমে অনেক রোগ ছাড়ায়। তাই কৃষককে নিরোগ বীজ সংগ্রহ করতে হবে বা বীজ শোধন করে বুনতে হবে।

২। **বীজ শোধন :** অনেক বীজ আছে নিজেরাই রোগ বহন করে। বীজবাহিত রোগ জীবাণু নীরোগ করার জন্য বীজ শোধন একটি উত্তম প্রযুক্তি। এজন্য ছত্রাক নাশক ব্যবহার করা হয়।

৩। **পরিষ্কার-**cwi”Qb **ফসল আবাদ করা :** ফসলের ক্ষেতে আগাছা থাকলে ফসল রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ আগাছা অনেক রোগের উৎস। তাই আগাছা পরিষ্কার করে চাষাবাদ করতে হবে।

৪। **রোগাক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলা বা মাটিতে পুতে ফেলা :** এক গাছ রোগাক্রান্ত হলে অন্য গাছেও ছড়িয়ে পড়ে। যাতে রোগ পুরো মাঠে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য নির্দিষ্ট রোগাক্রান্ত গাছটি তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। নতুবা মাটি খুঁড়ে পুতে ফেলতে হবে।

কাজ : ফসলের মাঠের ভিতর দিয়ে যাও, লক্ষ কর এই পাঠে উলিখিত লক্ষণ দেখা যায় কি না। যদি পাওয়া যায় তবে নমুনা হিসাবে কেটে নিয়ে আসো এবং তোমার ক্লাস শিক্ষককে দেখাও ও আলোচনা কর।

নতুন শব্দ : পাতার দাগ, ধসা, মোজাইক, বীজ শোধন, ছত্রাক, ভাইরাস

পাঠ- ৪ : মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা

মুরগির রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে রোগ-প্রতিরোধ করাই উত্তম কাজ, রোগ হয়ে গেলে দ্রুত এর we¯Ívi ঘটে। গোটা খামার এমনকি mg¯Í এলাকায় রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মুরগির অনেক রোগ হয়। যেমন, রাণীক্ষেত, আমাশয়, কলেরা প্রধান। মুরগির যাতে রোগ না হয় বা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে নিম্নরূপ কাজ করতে হবে।

১. সেনিটেশন বা পরিষ্কার-পরি”Qন্নতা

২. পৃথক্করণ

৩. টিকা দেওয়া

৪. ভালো ব্যবস্থাপনা

১. স্যানিটেশন: সঠিক স্যানিটেশন ও রোগজীবাণু kb¨KiY পদ্ধতি মুরগির রোগের প্রাদুর্ভাব কমায়। রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক পদ্ধতি হলো স্যানিটেশন। সেনিটেশন অর্থই n‡"Q মুরগির বাসস্থান m¤úY f\‡e পরিষ্কার রাখা ও মুরগির বিষ্ঠা এবং অন্যান্য আবর্জনা সরিয়ে ফেলা। মুরগির খাবার পাত্র, পানির পাত্র পরিষ্কার রাখা এবং মুরগির ঘরে বাতাস আগমন-নির্গমনের সুন্দর ব্যবস্থা করা। মুরগির বাসস্থান পরিষ্কার করার পর প্রথম কাজটি হলো বাসস্থানে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটানো। জীবাণুনাশক ঔষধের মধ্যে ফিনাইল, হাইপোক্লোরেট উলেখযোগ্য। মুরগির বাসস্থান শুকনা থাকা দরকার।

চিত্র : পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে মুরগি পালন

২. পৃথক্করণ: মুরগির পৃথক্করণ ব্যবস্থা মুরগির রোগ প্রতিরোধের ভালো ব্যবস্থা। পৃথক্করণ বলতে কম বয়সী মুরগিকে বয়স্ক মুরগি থেকে আলাদা রাখা এবং ইঁদুর জাতীয় প্রাণী ও হিংস্র পাখির উপদ্রব থেকে `‡i রাখাকে বোঝায়। এমনকি কুকুর, বিড়াল বা অন্য প্রাণী থেকেও মুরগিতে রোগ ছড়াতে পারে। যদি কোনো মুরগি মরে যায় তাৎক্ষণিক মৃত মুরগিকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

৩। টিকা : মুরগিকে যদি অনেক দিন রাখার পরিকল্পনা থাকে তবে এদের টিকা দিতে হবে। টিকা দিলে মুরগির রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয়। নিচে রাণীক্ষেত ও বসন্ত রোগের লক্ষণ উলেখ করা হলো। বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বিভিন্ন রকম। এখানে সাধারণ কয়েকটি রোগের লক্ষণ উলেখ করা হলো।

ক. রাণীক্ষেত রোগ হলে মুরগির শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং হা করে নিশ্বাস নেয়, মুখ দিয়ে লালা পড়ে ও নাক দিয়ে সর্দি ঝরে, চুনের মতো পাতলা মলত্যাগ করে, মাথা নিচু ও চোখ বন্ধ করে ঝিমোতে থাকে।

খ. বসন্ত রোগ হলে মুরগির পালকহীন স্থানে ও ঠোঁটের পাশে ফোস্কা দেখা যায় যা গুটিতে পরিণত হয়। মুরগির জ্বর থাকে ও খাওয়া কমে যায়।

চিত্র : মুরগির টিকা দেওয়া

ব্যবস্থাপনা : মুরগির ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো n‡"Q-

১। মুরগির ev"Pv i লালন-পালন পদ্ধতি
২। বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল
৩। খাদ্য ও পুষ্টি

মুরগির ev"Pv লালন পালন পদ্ধতি : মুরগির ev"Pv i লালন পালন বলতে মুরগির ev"Pv i জন্য সুন্দর বাসস্থান, পর্যাপ্ত খাবার, পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থাকে বোঝায়। ev"Pv বয়সের মাত্রা অনুযায়ী খাবার পাত্র ও পানির পাত্র দিতে হবে যাতে তারা সহজে খাবার ও পানি পেতে পারে। ঘরের তাপমাত্রা নির্ধারণ একটি গুরুত্বcÝ বিষয়। মুরগি বা মুরগির ev"Pv অধিক তাপমাত্রায় যেমন রাখা যাবে না তেমনি ঠাণ্ডায়ও রাখা যাবে না। গরম বা ঠাণ্ডা উভয়ই মুরগির ev"Pv i বেঁচে থাকার ওপর হুমকিস্বরূপ।

চিত্র : মুরগির বাচ্চা পালন

বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল : শ্বাসকষ্টজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য মুরগির বাসস্থানে যাতে বিশুদ্ধ মানের বাতাস প্রবেশ করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুরগির ঘরে বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা থাকলেই ঘরের আর্দ্রতা হ্রাস পাবে, এমোনিয়ার মাত্রা কমে যাবে এবং ধুলাবালির মাত্রাও কম হবে। বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য মুরগির ঘরে বৈদ্যুতিক পাখারও ব্যবস্থা করতে হবে। D"P মাত্রার এমোনিয়া ও ধুলোবালি মুরগির ফুসফুসে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এবং শ্বাসজনিত রোগের শিকার হয়।

খাদ্য ও পুষ্টি : মুরগির খাবারে যাতে পুষ্টির অভাব না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। মুরগির সুষম খাদ্য হওয়া দরকার এবং প্রচুর পুষ্টিরও উপস্থিতি প্রয়োজন। কোনো পুষ্টির অভাব ঘটলে মুরগি রোগের শিকার হয়। কাজেই মুরগির খাবারে যাতে প্রয়োজন মতো প্রোটিন, ভিটামিন-এ, ভিটামিন-ডি, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

কাজ :

এই পাঠের আলোকে লক্ষ কর তোমার মা নির্দেশিত ব্যবস্থায় মুরগি পালন করেন কি না। যদি না করেন তবে তোমার মাকে কী কী পরামর্শ দেবে সে m¤ú‡K wjL।

নতুন শব্দ : স্যানিটেশন, পৃথক্করণ, বিশুদ্ধ বাতাস

পাঠ-৫ : মাছের রোগ, প্রতিকার ও মৃত মাছের ব্যবস্থাপনা

নানা কারণে মাছের বাসস্থান নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি `wlZ n‡"Q| আবার `wlZ পানিতে মাছের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে। `wlZ পরিবেশের রোগ-জীবাণু মাছকে রোগাক্রান্ত করে তোলে। নদীতে বা পুকুরে বিভিন্নভাবে নানা জৈবিক পদার্থ যোগ n‡"Q| এগুলো যখন পচে তখন পানিতে মাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ আর থাকে না। আর নদীতে তো অহরহ শিল্পবর্জ্য পতিত n‡"Q| এসব কারণে পানিতে রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয় এবং মাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুকুরের চাষ করা মাছ হোক বা নদীর মাছই হোক নিচের রোগগুলো দ্বারা মাছ আক্রান্ত হয় এবং চিকিৎসা না হলে মরে যায়।

১। **লেজ ও পাখনা পচা রোগ :** মাছ চাষিদের নিকট এ রোগটি খুবই পরিচিত। এটি ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ। cK‡ii কোনো মাছ একবার রোগাক্রান্ত হলে সমগ্র cK‡i ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ : এই রোগ হলে মাছের লেজ ও পাখনায় ক্ষত সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থানে তুলার মতো ছত্রাক জন্মায় ও বিবর্ণ হয়। সময়মতো চিকিৎসা না করলে মাছ মরে যায়।

চিত্র : পাখনা ও লেজ পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

প্রতিকার : এই রোগের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করতে হবে।

ক) লেজের ও পাখনার ক্ষতস্থান কেটে ফেলতে হবে।

খ) অতঃপর আক্রান্ত মাছ শতকরা ২.৫ ভাগ লবণ পানিতে ধুতে হবে।

২। **মাছের ফুলকা পচা রোগ :** মাছের ফুলকা পচা রোগও ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ছাড়ায়। এই রোগ হলে মাছের শ্বাসকষ্ট হয় ও মাছ মরে যায়।

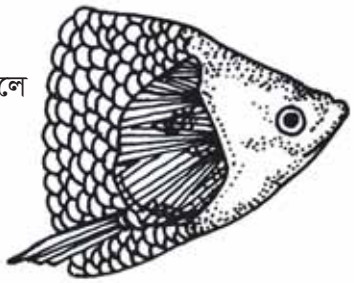

রোগের লক্ষণ : মাছের ফুলকায় রক্ত জমাট হয় এবং ফুলকা ফুলে যায়। মাছের স্বাভাবিক রং থাকে না। মাছ শ্বাসকষ্টে ভোগে।

প্রতিকার : এই রোগের জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে।

ক) পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

খ) তুঁতের দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে দুই বার চুবানো।

চিত্র : ফুলকা পচা রোগে আক্রান্ত মাছ

৩। **মাছের ক্ষত রোগ :** দূষিত পানির কারণে মাছের ক্ষত রোগের সৃষ্টি হয়। এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে মাছের শরীরে লাল লাল দাগ পড়ে। পরে ক্রমে ক্রমে এই লাল দাগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। মাছ স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে না।

চিত্র : ক্ষত রোগ

প্রতিকার : মাছের ক্ষত রোগ হলে নিচের ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করতে হবে।

ক) রোগাক্রান্ত মাছ জাল দিয়ে ধরে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

খ) পুকুরে প্রতি শতকে ১ কেজি হারে চুন ও লবণ ছিটাতে হবে। কয়েকদিন পরপর ২/৩ বার চুন ও লবণ প্রয়োগ করা যায়।

গ) পুকুর আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৪। **মাছের উকুন :** উকুন মাছের একটি পরজীবী শত্রু। এটি মাছের শরীর ও পাখনায় বাসা করে রক্ত শোষণ করে।

রোগের লক্ষণ :

ক) উকুনের আক্রমণে মাছের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং এ থেকে রক্ত ঝরে।

খ) উকুনের কামড়ে মাছ পানিতে অস্থির হয়ে দ্রুত চলাফেরা করে।

চিত্র : মাছের উকুন

প্রতিকার : উকুন দমনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

ক) ৫ মি.গ্রা. ডিপটারেক্স ১ লিটার পানিতে দ্রবণ তৈরি করে দ্রবণে আক্রান্ত মাছকে সপ্তাহে একবার ২৪ ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে।

খ) উক্ত দ্রবণ ১৫ দিন পর পর ২/৩ বার পুকুরে প্রয়োগ করেও মাছের উকুন দমন করা যায়।

মৃত মাছের ব্যবস্থাপনা : অনেক সময় চিকিৎসা করেও রোগাক্রান্ত মাছকে নিরোগ করা যায় না। বিপুল হারে মাছ মরতে শুরু করে। অতঃপর পচে দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশ `||Z হয়। এমতাবস্থায় নিচে উলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক) জাল দিয়ে মৃত মাছগুলোকে সংগ্রহ করতে হবে।

খ) পুকুর থেকে অনেক `‡i যেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পুকুরে প্রবেশ করবে না সেখানে তিন ফুট গভীর এবং মাছের সংখ্যানুযায়ী প্রশ¯Í করে গর্ত করতে হবে।

গ) গর্তে মৃত মাছ নিক্ষেপ করে এর ওপর বিচিং ছিটাতে হবে।

ঘ) অতঃপর মাটি চাপা দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

কাজ :

তোমাদের পাড়ার কয়েকটি পুকুরে মাছের রোগ হয়েছে। পরিদর্শনের জন্য শিকক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক তুমি ও তোমার সহপাঠীরা একটি দল গঠন কর। যেকোনো ছুটির দিনে পুকুরগুলো পরিদর্শন কর এবং প্রয়োজনমতো পরামর্শ দাও। তোমাদের কাজের ধাপগুলো লিখে শ্রেণিতে জমা দাও।

নতুন শব্দ : মাছের লেজ ও পাখনা পচা রোগ, ফুলকা পচা রোগ, মাছের উকুন

পাঠ- ৬ : গবাদি পশুর রোগ, প্রতিকার ও মৃত পশুর ব্যবস্থাপনা

গবাদিপশুর অনেক রোগ হয়। রোগের প্রকার ও আক্রান্তের মাত্রা অনুসারে চিকিৎসা করতে হয়। চিকিৎসার অভাব হলে রোগাক্রান্ত পশু মারাও যায়। নিচে গবাদিপশুর রোগব্যাধির একটি তালিকা দেওয়া হলো :

১।	খুরারোগ	৪। গলাফুলা	৭। বাদলা রোগ
২।	গো-বসন্ত	৫। ওলান প্রদাহ	
৩।	তড়কা	৬। কৃমি	

এখানে কয়েকটি রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা দেওয়া হলো।

খুরারোগ : সকল জোড়া খুরবিশিষ্ট গবাদিপশু খুরারোগে আক্রান্ত হয়। এটি একটি সংক্রামক রোগ। লালা, খাদ্যদ্রব্য ও বাতাসের মাধ্যমে সুস্থ প্রাণীরা সংক্রমিত হয়।

রোগের লক্ষণ : পশুর খুরায়, মুখে ও জিহ্বায় ফোসকার মতো দেখা যায়। পরে ফোসকা থেকে ঘা হয় এবং মুখ হতে লালা ঝরে। তাপমাত্রা বাড়ে ও খাবারে অরুচি হয়। ধীরে ধীরে পশু দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক সময় গরু মারা যায়। কম বয়স্ক পশু বা বাছুরের মৃত্যুর হার বেশি।

চিত্র : খুরা রোগ

রোগ প্রতিরোধ : একই বাসস্থানের কোনো গরু খুরারোগে আক্রান্ত হলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১। রোগাক্রান্ত গরুকে আলাদা করতে হবে ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে;

২। নরম খাবার দিতে হবে;

৩। সকল সুস্থ পশুকে খুরা রোগের টিকা দিতে হবে।

বাদলা রোগ : গবাদিপশুর ছয় মাস থেকে ২ বছর বয়স পর্যন্ত এই রোগ হতে দেখা যায়। এটি একটি সংক্রামক ব্যাধি। ক্ষতস্থান ও মলের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ : বাদলা রোগে আক্রান্ত হলে পশুর নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায়:

১। আক্রান্ত পশু খুঁড়িয়ে হাঁটে; শরীরের বিভিন্ন স্থান ফুলে যায় ব্যথা অনুভব করে।

২। ফোলা স্থানে পচন ধরে ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত পশু মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ :

১। পশু চিকিৎসকদের পরামর্শ গ্রহণ ও এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন প্রদান করা।

২। ছয় মাস বয়স হওয়ার আগেB বাদলার প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা।

তড়কা রোগ

তড়কা একটি সংক্রামক ব্যাধি। নিম্নলিখিতভাবে তড়কা রোগ ছড়ায় :

১। তড়কা রোগে আক্রান্ত পশুর ms¯ú‡k এলে ভালো পশুও আক্রান্ত হয়।

২। ভেজা আবহাওয়ায় বিশেষ করে বর্ষাকালে এ রোগ বেশি হয়।

৩। শ্বাস-প্রশ্বাস ও বিভিন্ন মাছির মাধ্যমেও ছড়ায়।

৪। খাদ্যের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।

চিত্র : তড়কা রোগে আক্রান্ত গরু

রোগের লক্ষণ : নিচে তড়কা রোগের লক্ষণ উলেখ করা হলো :

১। তড়কা রোগ হলে পশু মাটিতে পড়ে যায়।

২। শরীরের তাপমাত্রা বাড়ে ও গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

৩। চিকিৎসার সময় পাওয়া যায় না— পশু মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ :

১। রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে পেনিসিলিন ইনজেকশন দেওয়া।

২। সুস্থ পশুকে পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক নিয়মিত টিকা প্রদান।

৩। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ পশু লালন পালন করা।

৪। মৃত পশুকে পুড়িয়ে বা গভীর গর্ত করে গর্তে পুঁতে ফেলা।

মৃত গবাদিপশুর ব্যবস্থাপনা : মৃত গবাদি পশুর জন্য নিচে উলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় :

১। লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে মৃত পশুকে পুড়ে ফেলতে হবে;

২। পরিমাণমতো আকারের গর্ত করে গর্তের ভেতর ভালো মতো চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর গর্তের ভেতর পশুটিকে ফেলে এর ওপর চুন ছিটিয়ে গর্তের মাটি ভরাট করতে হবে।

চিত্র : মৃত গবাদিপশুর ব্যবস্থা

কাজ :

তড়কা রোগে তোমাদের একটি গরু মারা গিয়েছে। লোকালয় থেকে দূরে একটি পরিত্যাক্ত জায়গায় গর্ত কর। এখন সবাই মিলে এই মৃত গরুর মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা কর।

নতুন শব্দ : খুরা রোগ, তড়কা রোগ, মৃত পশুর ব্যবস্থাপনা

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ

পাঠ- ৭ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ

কৃষক তাঁর ফসলের মাঠে কী কী ফসল ফলান তা আমরা দেখেছি কি? আমরা ফসলের মাঠ পরিদর্শন করব এবং দেখব কোন মাঠ ধানভিত্তিক, কোনটা ইক্ষুভিত্তিক, কোনটা তুলাভিত্তিক আর কোনটা পাটভিত্তিক।

মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণ বলতে কোনো একক ফসল বা একক প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে ফসল বিন্যাস, মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ ও খামার যান্ত্রিকীকরণকে বোঝায়। শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্য n‡"QÑ

১। কাঙ্ক্ষিত ফসল বিন্যাস শস্যের আবাদ বাড়ানো এবং কৃষকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

২। খামারের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করা এবং কৃষি পরিবেশের ওপর cwZKj প্রভাব কমিয়ে আনা।

৩। প্রচলিত শস্যবিন্যাসে উন্নত ফসলের জাত ও কলাকৌশলের সংযোগ ঘটানো।

৪। বীজের সাশ্রয় করা এবং উৎপাদন খরচ কমানো।

৫। প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষকদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও সমাধান করা।

১। **ফসলবিন্যাস :** বাংলাদেশের fwg নানা জাতের ফসল চাষের উপযোগী। তবে প্রতিটি কৃষকই ফসলের বিন্যাস করে আবাদ করেন। ফসলবিন্যাস অর্থ n‡"Q কৃষক সারা বছর বা ১২ মাস তার জমিতে কী কী ফসল ফলাবেন তার একটা পরিকল্পনা করা। ফসলবিন্যাস করা হয় মাটির গুণাগুণ, পানির প্রাপ্যতা, চাষ পদ্ধতি, শস্যের জাত, ঝুঁকি, আয় এসব বিষয় বিবেচনা করে। ফসলবিন্যাসে একটি শীম জাতীয় ফসল অর্ন্তভুক্ত করে সারের চাহিদা হ্রাস করা সম্ভব এবং তাতে মাটির উর্বরতাও বৃদ্ধি পাবে।

২। **মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ:** মিশ্র ও সাথি ফসলের চাষ বলতে একাধিক ফসল যা ভিন্ন সময়ে পাকে, বাড়-বাড়তির ধরন ভিন্ন, মাটির বিভিন্ন ¯—i থেকে খাদ্য আহরণ করে এগুলোর একত্রে চাষকে বোঝায়। মিশ্র ও সাথি ফসলে পোকামাকড়, রোগবালাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকি হ্রাস পায়।

৩। **kন্য চাষ পদ্ধতি :** kb¨ চাষ অর্থ n‡"Q বিনা চাষে ফসল ফলানো। বন্যাকবলিত এলাকায় ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসে kb¨ চাষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন, বন্যার পানি নেমে গেলে মাটিতে রস থাকা অবস্থায় মসুর, ভুট্টা, রসুন ইত্যাদি রোপণ বা লাগানো যায় এবং ভালো ফলনও পাওয়া যায়। এতে কৃষকের ৩-৪ সপ্তাহ সময় বাঁচে।

৪। **রিলে চাষ :** কৃষকেরা একটি শস্যে ফুল আসার পর কিন্তু কর্তনের প্রায় এক সপ্তাহ আগে কতিপয় সুবিধা পাওয়ার জন্য শীম জাতীয় বীজ বপন করেন। একেই রিলে চাষ বলা হয়। রিলে চাষের উদ্দেশ্য হলো সেচের সীমাবদ্ধতা, শ্রম ঘাটতি এবং সময়ের অভাব `i করা। আমাদের কৃষকেরা সাধারণত ধানের ক্ষেতে রিলে চাষ করে থাকেন। রিলে চাষ দ্বারা মাটির গঠন উন্নত হয় এবং উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

৫। m¤ú‡`i **সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার :** মাঠ ফসল বহুমুখীকরণের প্রধান উদ্দেশ্য n‡"Q- (১) অধিক উৎপাদন এবং (২) অধিক আয়। জমি, সার, বীজ, সেচের পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষি প্রযুক্তি, সময় এগুলো n‡"Q কৃষকের কৃষি m¤ú`| কৃষকের আয় নির্ভর করে m¤ú‡`i সুষ্ঠু ব্যবহারের ওপর। যেমন- মিশ্র বা সাথি ফসলের চাষ হতে কৃষক অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন। আবার বিনা চাষে ফসল ফলালে সময় ও অর্থ উভয়ের সাশ্রয় হয়। আবার ফসল বিন্যাসে সীম জাতীয় শস্য আবাদের ব্যবস্থা থাকলে সারের চাহিদা হ্রাস পাবে।

চিত্র : আখের সাথে আলু

চিত্র : গম, মুগ, ভুট্টা

চিত্র : শস্য বহুমুখীকরণ

কাজ :

লক্ষ কর যে তোমাদের গ্রামের কৃষকেরা শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন কি না। করে থাকলে যে সকল বিষয় শস্য বহুমুখীকরণের সাথে জড়িত সেগুলো মানা হয় কি না তা পর্যবেক্ষণ কর। দ্বিতীয়ত কোন ফসলের সাথে কোন ফসলের সাথি চাষ বা রিলে চাষ হয় তার একটা তালিকা তৈরি কর এবং শিক্ষক মহোদয়কে দেখাও।

শিক্ষক মহোদয় কৃষিতথ্য সার্ভিস থেকে সিডি সংগ্রহ করবেন ও ছাত্রদেরকে শস্য বহুমুখীকরণের বিষয়গুলো সচিত্র দেখাবেন।

নতুন শব্দ : শস্য বহুমুখীকরণ, ফসলবিন্যাস, মিশ্র চাষ, সাথি ফসল, m¤ú‡`i সুষ্ঠু ব্যবহার

পাঠ-৮ : মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার

বাংলাদেশের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন। এখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহের প্রাধান্য আছে। ফলে সারা বছরই এখানে তিনটি মৌসুমে নানাবিধ ফসল উৎপাদন করা যায়। এগুলো হলো রবি, খরিপ-১, খরিপ-২। প্রতি মৌসুমে কৃষক তাঁর ফসলবিন্যাসে সেসব ফসল অন্তর্ভুক্ত করেন। ফসলের উৎপাদন সময়, মাটির উর্বরতা, সেচের সুবিধা এসব বিষয় বিবেচনায় এনে ফসল নির্বাচন করেন। নিচে মাঠ ফসলের বহুমুখীকরণের ব্যবহার হিসেবে ৩টি নমুনা উলেখ করা হলো।

১। **আলুর সাথে রিলে ফসল হিসাবে পটলের চাষ :** এটি শস্য বহুমুখীকরণের একটি উলেখযোগ্য উদাহরণ। কৃষক নিজেদের আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে চাষাবাদে অনেক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার মধ্যে আলুর সাথে রিলে ফসল হিসাবে পটলের চাষ বেশ জনপ্রিয়। রিলে ফসল অর্থ n‡"Q একটি ফসলের শেষ পর্যায়ে আর একটি ফসলের চাষ শুরু করা।

অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কৃষকেরা আগাম আলু চাষ করেন। ৫৫ সে.মি. `i‡Z সারি করা হয় এবং আলু লাগানো হয়। প্রতি তৃতীয় সারি ফাঁকা রেখে সে সারিতে ডিসেম্বরে পটলের ডগা রোপণ করা হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে আলু উত্তোলন শেষ হয়। পটল বড় হতে থাকে এবং মার্চ মাস থেকে পটল ধরতে থাকে এবং নভেম্বর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়।

এ প্রযুক্তিতে পটলের জন্য আর সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন পড়ে না। আর একই জমি হতে এভাবেই বাড়তি আয় সম্ভব।

২। **আলুর সাথে রিলে ফসল হিসাবে করলার চাষ :** আলুর সাথে করলা চাষেরও বড় সুযোগ রয়েছে। তাই DËi¶Â‡ji কৃষকেরা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলুর সাথে করলার চাষের নতুন পদ্ধতি শুরু করেছেন। কৃষক আগাম সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সারিতে আলু বীজ লাগান। দুই সারির মাঝখানে নালা তৈরি হয়। আলু লাগানোর পর পলি ব্যাগে করলার চারা গজানো হয়। জানুয়ারি মাসে দুই সারির মাঝের নালায় করলার চারা রোপণ করা হয়। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে mg¯Í আলু উত্তোলন করা হয়। আলু তোলার পর করলা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বড় হতে থাকে এবং মার্চ থেকে করলা ধরতে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত করলা তোলা হয়। শস্যবহুমুখীকরণের এটি আরও একটি কৃষি প্রযুক্তি।

৩। **মিশ্র ফসল হিসাবে আলু ও লাল শাকের চাষ :** লাল শাক স্বল্পমেয়াদি কিন্তু দ্রুত বর্ধনশীল। আলুর সাথে লাল শাকের চাষ একটি ভালো মিশ্র চাষ। আগেই বলা হয়েছে যে, সারিতে আলুর চাষ করা হয়। আলু গাছের D"PZ¶ ৫-৬ সে.মি. হয় তখন সারি বরাবর প্রথম মাটি তোলা হয়। এই তোলা মাটিতে লাল শাকের বীজ বপন করা হয়। আলু ও লাল শাক দুটোই সমানে সমান বাড়তে থাকে। লাল শাক দ্রুত বর্ধনশীল। তাই কয়েক দফা শাক ওঠানো হয়। ডিসেম্বর পর্যন্ত লাল শাক ওঠানো যায়। লাল শাক তোলার পরও আলু বড় হতে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে আলু তোলা হয়।

ওপরে উলিখিত শস্যবহুমুখীকরণ পদ্ধতি ছাড়াও সাথি ফসল হিসাবে-

১. আখের সাথে টমেটোর চাষ হয়;

২. আখের সাথে সরিষার চাষ হয়;

৩. আখের সাথে মসুরের চাষ হয়।

মিশ্র ফসল হিসাবে-

১. মসুরের সাথে সরিষার চাষ হয়;

২. আউশের সাথে তিলের চাষ হয়;

৩. কলা বাগানে আউশের চাষ হয়।

চিত্র : কলার সাথি ফসল আলু

কাজ :

১। তুমি তোমার বাবার কাছ থেকে ৫ শতক জমি চেয়ে নাও। জমিতে প্রধান ফসল হিসাবে আলুর চাষ কর। এই পাঠের শেখানো মতে তুমি আলুর সাথে পটলের রিলে চাষ কর।

২। শিক্ষক স্কুলসংলগ্ন জমিতে ছাত্রদেরকে নিয়ে সাথি ফসলের চাষ করবেন। জমিতে দুই লাইন সরিষা বুনে এর মাঝে মসুরের বীজ বপন করে ছাত্রদেরকে সাথি ফসলের প্রদর্শন করবেন। চাষের পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখবে।

নতুন শব্দ : মিশ্র ফসল, রিলে ফসল

পাঠ-৯ : শস্য পর্যায়ের ধারণা

শস্য পর্যায় একটি উন্নত কৃষি প্রযুক্তি। এর দ্বারা মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে, ফসল ভালো হয়, অধিক ফলন হয়। রোগ-পোকা কম হয় এবং সারের কার্যকারিতা ভালো হয়। প্রযুক্তি হিসাবে শস্য পর্যায়ের ব্যবহার সব দেশেই প্রচলিত। মাটিকে উন্নত অবস্থায় রেখে অধিক ফসল পেতে শস্য পর্যায়ের তুলনা নেই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এই প্রযুক্তির প্রচলন আছে। শস্য পর্যায় m¤ú‡K কৃষকদের বৈজ্ঞানিক ধারণা নেই সত্য কিন্তু তারা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন যুগের পর যুগ ধরে।

মাটির উর্বরতা বজায় রেখে এক খণ্ড জমিতে শস্য ঋতুর বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা হয় তাই শস্য পর্যায়। একই জাতের ফসল একই জমিতে বার বার উৎপাদন না করে অন্য জাতের ফসল উৎপাদন করাই n‡"Q শস্য পর্যায়। যেমন, Mfxigjx ফসল উৎপাদনের পর AMfxigjx জাতীয় ফসলের আবাদ করা উচিত। ফলে পোকা-মাকড় ও রোগ-পোকার উপদ্রব কম হয়।

কৃষক শস্য পর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তার সমগ্র জমিকে তিন বা চার খণ্ডে ভাগ করেন। প্রথম বছর খণ্ডগুলোতে রবি, খরিফ-১, খরিফ-২ মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ফসল ফলানো হয়। প্রথম বছর শেষ হলে দ্বিতীয়

বছরে প্রথম খন্ডের ফসল দ্বিতীয় খন্ডে, দ্বিতীয় খন্ডের ফসল তৃতীয় খন্ডে- এভাবে শেষ খন্ডের ফসল প্রথম খন্ডে চাষ করা হয়। দ্বিতীয় বছরের পরে তৃতীয় বছরে একই ভবে বিভিন্ন ফসলের খন্ড পরিবর্তন হয়। তৃতীয় বছরে শস্যের আবর্তন শেষ হয় এবং প্রত্যেক ফসলই প্রতি খন্ডে একবার করে চাষ করা হয়।

শস্য পর্যায়ের ফলাফল :

ক) শস্য পর্যায়ের ফলে D"P মাত্রায় শস্য বহুমুখীকরণ প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়;

খ) পোকা-মাকড়, রোগ বালাই ও আগাছার আক্রমণ হ্রাস পায়;

গ) বিভিন্ন মোড়ক বিশিষ্ট ফসল উৎপাদন হয় বলে মাটিতে গাছের পুষ্টি বজায় থাকে;

ঘ) গাছ পরিমিত পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে;

ঙ) মাটিতে নাইট্রোজেন যুক্ত হয় এবং

চ) কীটনাশকের ব্যবহার কমায়।

শস্য পর্যায়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে এমনসব ফসল নির্বাচন করতে হবে যাতে নিচে উলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়;

১। পর পর একই ফসলের চাষ না করা;

২। একই শিকড় বিশিষ্ট ফসলের চাষ না করা;

৩। ফসলের পুষ্টির চাহিদার কম-বেশি অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা;

৪। ফসলের তালিকায় ডাল ফসল অর্ন্তভুক্ত করা;

৫। সবুজ সার যেমন, ˆaÂ| চাষ করা;

৬। গবাদি পশুর খাবারের জন্য ঘাসের চাষ করা;

৭। খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসলের চাষ করা;

৮। শস্য উৎপাদনের ঝুঁকি কমায়।

শস্য-পর্যায় প্রযুক্তির সুবিধা

শস্য পর্যায়ের অনেক সুবিধা লক্ষ করা যায়। সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১। শস্য-পর্যায়ের প্রযুক্তি ব্যবহারে মাটির উর্বরতা সংরক্ষিত হয়;

২। মাটির পুষ্টির সমতা বজায় থাকে;

৩। আগাছার উপদ্রব কম হয়;

৪। রোগ-পোকার উপদ্রব কম হয়;

৫। পানির অপচয় কম হয়;

৬। ফসলের ফলন বাড়ে;

৭। গবাদি পশুর খাবারের ব্যবস্থা হয়।

চিত্র : বিভিন্ন ফসলের শস্য পর্যায়

কাজ :

তোমার গ্রামের কৃষকেরা শস্য পর্যায় ব্যবহার করেন। তুমি তাদের সাথে আলোচনা করে ধারণা নাও। গ্রামের কৃষকেরা কেন এবং কীভাবে শস্য-পর্যায় অনুসরণ করেছেন সে m¤ú‡K wjL।

নতুন শব্দ : শস্য পর্যায়, Mfxigjx, AMfxigjx

পাঠ- ১০ : শস্য পর্যায়ের ব্যবহার

ceeZx পাঠে আমরা শস্য পর্যায়ের ধারণা পেয়েছি। আরও ধারণা পেয়েছি যে আমাদের কৃষক জেনে অথবা না জেনে শস্য পর্যায় প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তি হয়ত তাঁরা দিতে পারবেন না। কিন্তু এতটুকু জ্ঞান তাদের আছে যে, একই ফসল একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ করলে ফলন কম হয়। মাটির উর্বরতা কমে যায়। পোকা-মাকড় ও রোগসহ নানা সমস্যা দেখা দেয়। কৃষকেরা তাদের জমিতে যত ফসল ফলান সেগুলোকে রবি, খরিপ-১, খরিপ-২ এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। কাজেই কৃষক প্রথমত মৌসুম অনুযায়ী কী ফসল চাষ করবেন তা নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয়ত কোন জমিতে কী ফসল ফলাবেন তাও নির্ধারণ করেন। শস্য পর্যায়ের বিধি অনুযায়ী কৃষকের জমিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করার প্রয়োজন পড়ে। আর খণ্ডগুলোর আকার সমান রাখার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের কৃষকদের জমি বিভিন্ন খণ্ডে ভাগ হয়ে আছে যা আকারে সমান নাও হতে পারে। কৃষকদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তাঁরা জমি ও ফসল নির্বাচন করেন।

cÂMo ও ঠাকুরগাঁও জেলার প্রায় সব এলাকা এবং দিনাজপুরের উত্তর-পশ্চিম অংশ কৃষি পরিবেশ-১ এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে উঁচু, মাঝারি উঁচু, মাঝারি নিচু জমি আছে। এখানকার কৃষক গম, পাট অথবা বোনা আউশ, কাউন, রোপা আমন, আলু, শাক-সবজি, মুগডাল, আখ, মরিচ, বোরো, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করেন। কৃষকেরা বৃষ্টিপাত নির্ভর ফসল ফলান আবার সেচ নির্ভর ফসলও ফলান। এখানকার কৃষক কী কী শস্যপর্যায় ব্যবহার করেন তা দেখলে আমরা কৃষকের শস্যপর্যায় ব্যবহারের একটা ev¯Íe চিত্র পাব।

মনে করি ঠাকুরগাঁওয়ের কোনো কৃষকের চার খণ্ড জমি আছে। তিনি চার বছরের শস্য পর্যায়ের একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি রবি, খরিপ-১ এবং খরিপ-২ মৌসুমভিত্তিক গম, পাট/আউশ, রোপা আমন, আলু, শাক-সবজি, ^aÂv, আখ, মরিচ, তিল ইত্যাদি ফসল ফলাবেন। এগুলো ফলানোর জন্য কৃষক বছরওয়ারি নিম্নোক্ত শস্য পর্যায় গ্রহণ করতে পারেন। শস্য পর্যায়ক্রমে দেখা যায় যে প্রথম বছরে যেভাবে ফসল উৎপাদন শুরু হয়েছিল চতুর্থ বছরে আবার সেভাবেই শেষ n‡”Q|

সময়	খন্ড-১	খন্ড-২	খন্ড-৩	খন্ড-৪
১ম বছর	রবি : বোরো খরিপ-১ : পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি, মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন
২য় বছর	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ : রোপা আমন	রবি : বোরো খরিপ-১:পাট, বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত
৩য় বছর	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন	রবি : বোরো খপির-১ : পাট/বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : সরিষা/গম খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন
৪র্থ বছর	রবি : গম খরিপ-১ : পাট, বোনা আউশ খরিপ-২ : পতিত	রবি : গম/সরিষা খরিপ-১ : মুগ খরিপ-২ : রোপা আমন	রবি : গোল আলু খরিপ-১ : মাষকলাই খপির-২ : রোপা আমন	রবি : ফুলকপি, বাঁধাকপি মুলা, টমেটো খরিপ-১ : ভুট্টা খরিপ-২ : বেগুন

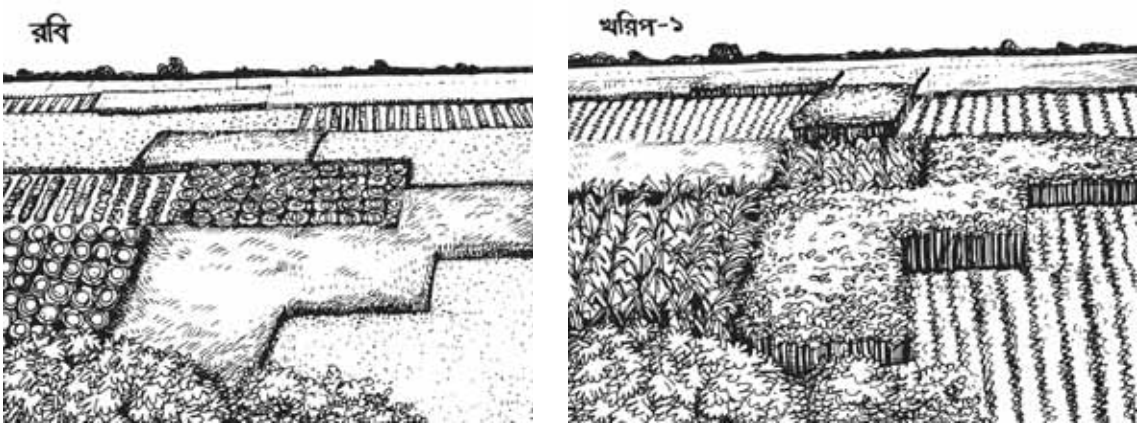

চিত্র : শস্যপর্যায়ের ব্যবহার

কাজ :

তোমার বাবা তোমার কাছে একটি শস্য-পর্যায়ের পরিকল্পনা চাইলেন। উলিখিত নমুনা শস্য-পর্যায়ের আলোকে তোমার বাবার জন্য একটি শস্য-পর্যায় পরিকল্পনা কর যেন আগামী রবি মৌসুম হতে ব্যবহার করা যায় এবং পরিকল্পনাটি শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শব্দ : রবি, খরিপ-১, খরিপ-২

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. ..... ইউরিয়া ব্যবহারে ফলন বৃদ্ধি পায়।

২. পশু মোটাতাজাকরণে সহায়ক খাদ্য ..... ও ..... ।

৩. ধানগাছের বাদামি দাগ রোগের কারণ ..... ।

৪. কৃষকেরা ..... মাসে আগাম আলু চাষ করেন।

বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

বামপাশ	ডানপাশ
১. ফসলের পাতা কুঁকড়িয়ে যায়	অধিক আয়
২. মাঠ ফসল বহুমখীকরণের উদ্দেশ্য	ক্ষত সৃষ্টি করে
৩. বাংলাদেশে জলবায়ু	উন্নত কৃষি প্রযুক্তি
৪. শস্য পর্যায় একটি	ভাইরাসের কারণে
	আর্দ্র ও উষ্ণভাবাপন্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খুরারোগে পশুর দেহের কোন অঙ্গে ঘা হয়?

ক. ত্বকে খ. অন্ত্রে

গ. মুখে ঘ. কুঁজে

২. গরুকে ইউরিয়া ও ঝোলাগুড় খাওয়ানোর উপায়-

i. খড়ের সাথে মিশিয়ে

ii. দানাদার খাদ্যের সাথে

iii. পানির সাথে মিশিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩. মাছের ফুলকা পচা রোগ প্রতিকারে করণীয়-

i. পুকুরে তাড়াতাড়ি চুন দেওয়া

ii. পুকুরে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা

iii. মাছকে Z‡Zi দ্রবণে ডোবানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের Ab‡"Q`wU পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিনা বেগমের বাড়ির আঙিনায় ৩মি. x ৪মি. আকৃতির উঁচু খালি জায়গা রয়েছে। ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে উক্ত জায়গায় গোশালা নির্মাণ করে গরু মোটাতাজাকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

৪. রিনা বেগম তার আঙিনায় কয়টি গরুর বাসস্থান নির্মাণ করতে পারবেন?

ক. ৪টি খ. ৩টি

গ. ২টি ঘ. ১টি

৫. রিনা বেগমের খামারটি তাঁর পরিবারে কী ধরনের সুফল বয়ে নিয়ে আসবে?

ক. আমিষের ঘাটতি পূরণ করবে খ. শর্করার ঘাটতি পূরণ করবে

গ. গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে ঘ. দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি করবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মাছ চাষি মনিরের এক একর আয়তনের পুকুরে মাছের হঠাৎ রোগ দেখা যায়। অনেক চেষ্টা করেও তিনি রোগের হাত থেকে মাছকে রক্ষা করতে পারলেন না। ব্যাপক হারে তাঁর cK‡ii মাছ মারা গেল। জাল টেনে মরা মাছগুলো সংগ্রহ করে মনির সেগুলো সৎকারের ব্যবস্থা নিলেন। পরবর্তী বছর তাঁর cK‡ii পানি ও মাটির ভৌত গুণাগুণ পরীক্ষা করার পর মাছ ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ক. সংক্রামক রোগ কী?

খ. পুকুরে চুন প্রয়োগ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. মনিরের গৃহীত ব্যবস্থাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পরবর্তী সময়ে মাছ মনিরের সিদ্ধান্তের যৌক্তকতা বিশ্লেষণ কর।

২.

চিত্র : ক চাষপদ্ধতি

চিত্র : খ চাষপদ্ধতি

ক. সাথি ফসল কাকে বলে?

খ. রিলে চাষের মাধ্যমে কীভাবে সময়ের অভাব `i করা যায়?

গ. কোন চাষ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কম, কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কোন চাষ পদ্ধতিটি কৃষি পরিবেশের ওপর প্রভাব we¯Ív‡i সক্ষমতা বিশেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শস্য পর্যায় কী?

২. মিশ্র ফসল চাষ কাকে বলে?

৩. সংক্রামক রোগ কাকে বলে?

৪. মোটাতাজাকরণ কী?

রচনামলক প্রশ্ন

১. গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা লিখ।

২. খড়ের সাথে ইউরিয়া মিশিয়ে গো-খাদ্য তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. মাছের ক্ষতরোগের কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার লিখ।

৪. শস্য বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা কর।

তৃতীয় অধ্যায়
কৃষি উপকরণ

আমরা ceeZx শ্রেণিতে বিভিন্ন ধরনের কৃষি উপকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ অধ্যায়ে বীজবপনে উপযুক্ত মাটি কীভাবে c¯‘Z করা যায়, কীভাবে আদর্শ বীজতলা তৈরি এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় এবং জমিতে কীভাবে সাশ্রয়ীরূপে সার ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হবে। বীজতলার মাটি যদি উপযুক্তভাবে তৈরি করা না যায় তবে অনেক বীজ গজাবে না। যথাযথভাবে বীজতলা তৈরি না হলে ও রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে উপযুক্ত মাটি থাকা সত্ত্বেও চারা ভালো হবে না। আর একটি বিষয় হলো জমিতে সার প্রয়োগ করতে অধিকাংশ কৃষক নিয়ম অনুসরণ করেন না। এতে একদিকে সারের অপচয় হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ¶wZM¯— হয়। কাজেই এ অধ্যায়ের বিষয়গুলো আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত।

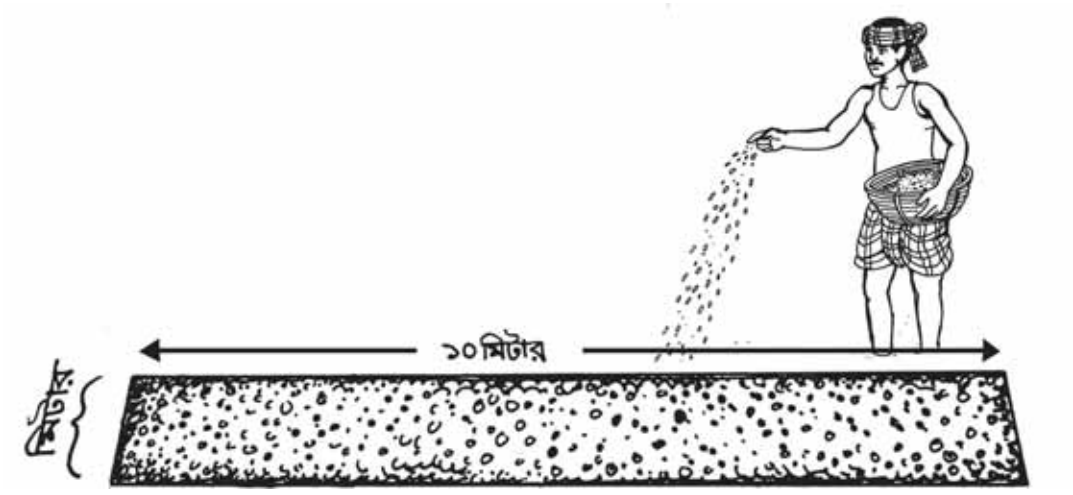

চিত্র : কাদা মাটির জন্য বীজতলা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত মাটি c¯‘Z বর্ণনা করতে পারব;
- বীজ বপনের জন্য মাটি c¯‘Z করতে পারব;
- একটি আদর্শ বীজতলা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একটি আদর্শ বীজতলার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- D"P ফলনের সাথে ভালো বীজ নির্বাচন ও সংরক্ষণের mn¤úK স্থাপন করতে পারব।

পাঠ–১ : নার্সারিতে বীজ বপনে উপযুক্ত মাটি প্রস্তুত।

আমরা জানি বীজতলায় বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বীজ তলার মাটি ভালোভাবে c¯‘Z না করে বীজ বপন করলে ভালো চারা উৎপাদন হয় না।

বীজতলার মাটি c¯‘Z করার জন্য যে যে উপকরণ লাগবে তা হলো- জমি/মাটি, খুঁটি, জায়গা মাপার ফিতা, কোদাল, জৈব ও অজৈব সার ইত্যাদি। আমাদের দেশে দু'ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়।
যথা- (ক) শুকনো (খ) ভেজা।

এখন আমরা বীজতলার মাটি c¯‘wZi নিয়মগুলো জানব।

নিয়মগুলো হলো–

(ক) সরাসরি বপনের ক্ষেত্রে–

১. বীজতলার চারা পাশে ৩০ সে.মি. চওড়া ও ১৫ সে:মি: গভীর নালা তৈরি করতে হবে;

২. বীজতলার মাটি ২০-২৫ সে.মি. উঁচু রাখতে হবে;

৩. ১৫-২০ সে.মি. গভীর করে বীজতলার মাটি চাষ করতে হবে;

৪. এ অবস্থায় মাটি ২-৪ দিন রেখে দিলে মাটিতে রোদ লাগবে, পোকা বের হলে পাখি খেয়ে ফেলবে;

৫. এরপর ঘাস, শিকড়, পাথর ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে;

৬. মাটি এঁটেল হলে অন্য জায়গা থেকে দোআঁশ মাটি এনে বীজতলায় মেশাতে হবে; কিন্তু মাটি বেলে হলে জৈব পদার্থ ও দোআঁশ বা এঁটেল মাটি যোগ করতে হবে।

৭. বৃষ্টির পানি বা বাতাসে মাটি সরে যেতে পারে সেজন্য চারপাশে ছিদ্র করা ইট বা অন্য কিছু দিয়ে ঘিরে দিলে ভালো হয়;

৮. বীজতলার দলা বা ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরা করে মাটি সমান করতে হবে;

৯. বীজ বপনের ১০-১২ দিন আগে বীজতলায় টিএসপি, এমপি ও পচা শুকানো গোবর বা আবর্জনা সার মিশিয়ে দিতে হবে;

১০. সারের পরিমাণ নার্সারির আকারের ওপর নির্ভরশীল তাই সার নার্সারির আকার অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে;

১১. বীজতলার মাটিতে পোকা বা রোগ জীবাণু থাকতে পারে। তাই কিছু খড় বিছিয়ে দিয়ে তাতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলে মাটি কিছুটা জীবাণুমুক্ত হবে;

১২. মাটি শোধনের জন্য গ্যামাক্সিন বা ফরমালডিহাইড জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এভাবে c¯‘ZKZ মাটি বীজ বপনের উপযোগী হবে। শুকনো বীজতলায় সরাসরি বীজ করা যাবে। তবে ভেজা বীজতলার ক্ষেত্রে মাটি পানি দ্বারা ভিজিয়ে কাদা করে সমান করতে হবে। অতঃপর বীজ বপন করতে হবে।

(খ) পলিব্যাগে ভরার জন্য মাটি : উপরোক্ত (১-১২) পর্যন্ত নিয়মে c¯‘ZKZ মাটি চালনি দ্বারা চেলে ঢেলামুক্ত করতে হবে। তারপর নির্ধারিত মাপের পলিব্যাগে মাটি ভরাট করতে হবে।

শিক্ষকের কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করবেন এবং উত্তরগুলো বোর্ডে লিখবেন–

১। বীজ বপনের জন্য মাটি c¯‘Z করা প্রয়োজন কেন?

২। জমি চাষ করার পর মাটির ঢেলা ভাঙা হয় কেন?

৩। মাটি শোধন করা হয় কী দিয়ে?

৪। মাটি শোধন করার দরকার কেন?

অতঃপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলোও পৃথকভাবে বোর্ডে লিখবেন।

হাতে-কলমে কাজ :

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট জায়গায় বীজ বপনের জন্য মাটি c¯‘Z করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে মাটি তৈরির নিয়মগুলো ধারাবাহিকভাবে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে। এ কাজটি m¤úv`b করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে থেকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন এবং m¤úY কাজটি m¤úv`‡bi জন্য ২ পিরিয়ড সময় বরাদ্দ রাখতে পারেন।

পাঠ–২ : আদর্শ বীজতলা তৈরি

বীজতলা বিভিন্ন আকারের হতে পারে। এখন আমরা একটি আদর্শ বীজতলা m¤ú‡K জানব। এ ধরনের বীজতলার আকার-আকৃতি, সার প্রয়োগ, মাটি c¯‘Z ও রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক নিয়মে হয়ে থাকে। শ্রেণিকক্ষে আদর্শ বীজতলার একটি মডেল চিত্র দেখাবেন। মডেল চিত্র দেখে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তা আঁকতে বলবেন। এরপর শিক্ষক আদর্শ বীজতলার নিয়মাবলি উলেখ করবেন।

(ক) ধান ফসলের বীজতলা : বীজতলায় বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয় এবং রোপণের আগ পর্যন্ত চারার যত্ন নেওয়া হয়। তাই ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরির জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করা হয়। সাধারণত বীজতলা দু'ভাবে তৈরি করা হয়। যথা– (ক) ভেজা কাদাময় বীজতলা; (খ) শুকানো বীজতলা। শুকানো বীজতলা উঁচু বেলে দোআঁশ মাটিতে এবং ভেজা কাদাময় বীজতলা এঁটেল মাটিতে তৈরি করা হয়। গাছের ছায়া পড়ে না ও বর্ষার পানিতে ডুবে যায় না, এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করা হয়।

আদর্শ বীজতলার গঠন :

(১) প্রতিটি বীজতলার আকার হবে ১০ মিটার × ১ মিটার এবং খুঁটি দিয়ে তা চিহ্নিত করতে হবে; (২) দুটি বীজতলার মাঝে ২৫-৩০ সে.মি. ও জমির চারপাশে ২৫ সে.মি. জায়গা নালার জন্য রাখতে হবে; (৩) দু'টি বীজতলার মাঝের ও চারপাশের জায়গা থেকে মাটি তুলে বীজতলা ৭-১০ সে.মি. উঁচু করতে হবে; (৪) বীজতলার প্রতি বর্গমিটারে ২ কেজি হারে গোবর বা K‡¤úv÷ সার প্রয়োগ করে বীজতলার মাটির সাথে মেশাতে হবে; (৫) এবার

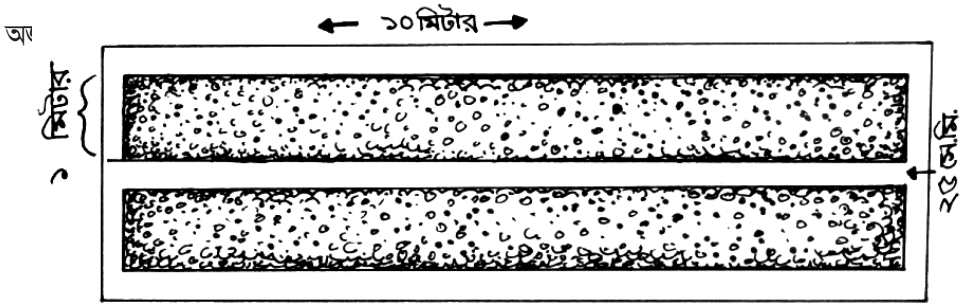

চিত্র : ১০ বর্গ মি.+ ১০ বর্গ মি. = ২০ বর্গমিটার আদর্শ ধান বীজতলা (২৫ সেমি. বর্ডারসহ)

(খ) **উদ্যান ফসলের বীজতলা :** নার্সারিতে উদ্যান ফসলের exR/Pviv/÷¨vu¤ú বপন বা রোপণ করে gj জমিতে রোপণের উপযোগী করে তোলা হয়। এর ফলে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত হয় এবং অল্প জায়গায় সুষম পরিচর্যার মাধ্যমে বেশি চারা উৎপাদন করা হয়।

আদর্শ বীজতলার গঠন :

(১) নার্সারির বেড তৈরির জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু, আলো-বাতাসযুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে; (২) প্রতিটি বেডের আকার হবে ৩ মিটার × ১ মিটার এবং খুঁটি দিয়ে তা চিহ্নিত করতে হবে; (৩) কোদাল দিয়ে ভালোভাবে কুপিয়ে বেড তৈরি করতে হবে; (৪) প্রতিটি বেডে ২৫ কেজি গোবর বা K‡¤úv÷ সার দিয়ে মাটির সাথে উত্তমরূপে মেশাতে হবে; (৫) পাশাপাশি দু'টো বেডের সাথে ৫০ সে.মি. নালা তৈরি করতে হবে; (৬) নালার মাটি পাশাপাশি দু'টি বেডে ভাগ করে দিতে হবে যেন বেডের D"PZv fwg থেকে ১০ সে.মি. উঁচু হয়; (৭) এরপর প্রতি ৩ বর্গমিটার বেডের জন্য ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমপি সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে; (৮) মাটি অধিক অম্লীয় হলে বেড প্রতি ১৫০ গ্রাম চুন প্রয়োগ করতে হবে; (৯) রশি, খুঁটি সরিয়ে বেডের ওপরের মাটি সমান করে বীজ বপন করতে হবে; (১০) শাক-সবজির বীজ বপনের হার নিম্নের ছক অনুসারে হতে হবে।

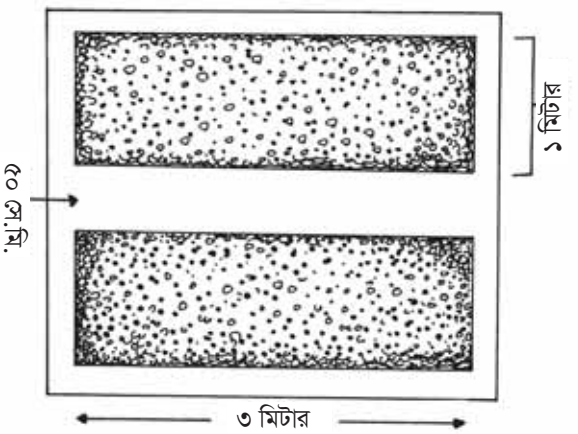

চিত্র : আদর্শ উদ্যান বীজতলা

বীজতলায় বীজ বপনের হার :	
সবজির নাম	বীজ বপনের হার (গ্রাম)
ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি	১০ -১২
ওলকপি	১৫-২০
শালগম	১২-১৪
টমেটো	৮-১০
বেগুন	১০-১২
মরিচ	১৮-২৪
লেটুস	৮-১২
পেঁয়াজ	১৮-২৪

অতঃপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো বোর্ডে লিখে দেবেন।

পাঠ–৩ : বীজতলা রক্ষণাবেক্ষণ

বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা উৎপন্ন হয়। আর এসব চারা জন্মায় ও বড় হয় বীজতলায়। কাজেই বীজতলা সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে বীজতলার রক্ষণাবেক্ষণ m¤ú‡K উলেখ করা হলো :

(১) বীজতলার মাটি সমান রাখতে হবে; (২) বীজতলার আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে; (৩) বীজতলায় পোকা ও রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে দমনের ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) দু'টি বেডের মাঝে নালায় সবসময় পানি রাখার জন্য সেচের ব্যবস্থা করতে হবে; (৫) চারা হলদে দেখালে প্রতি শতক বীজতলার জন্য ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া বীজতলায় ছিটাতে হবে (mÎ-K¨lকথা/১৪১৫); (৬) বীজতলায় কখনো কাঁচা গোবর প্রয়োগ করা যাবে না; (৭) ছাগল, ভেড়া ও গরু-বাছুরের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে; (৮) বীজতলা যাতে বেশি শুকিয়ে না যায় সেদিক লক্ষ রেখে ছায়া প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

কাজ : পাঠ gj¨vq‡bi জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো দলীয়ভাবে সমাধান করতে দলীয় কাজ দেবেন এবং কাজ শেষে দলনেতার মাধ্যমে উপস্থাপন করাবেন।

(১) বীজতলা বলতে কী বোঝায়? (২) বীজতলার স্থান নির্বাচন করতে হলে কোন বিষয়গুলোর প্রতি বেশি দৃষ্টি দেবে? (৩) কোন জায়গায় কী ধরনের চারা উৎপাদন করা যায়? (৪) চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জায়গার পরিমাণ কীভাবে নির্ধারণ করবে? (৫) বীজতলায় বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন কেন? (৬) বীজতলা স্থাপনে সবচেয়ে ¸iZcY কাজ কী? (৭) পাহাড়ি এলাকায় কীভাবে বীজতলা তৈরি করা হয়? (৮) কোন কোন গাছ দিয়ে বীজতলার বেড়া দেওয়া যায়? (৯) কোন ধরনের মাটি বীজতলার জন্য উত্তম?

পাঠ–৪ : জমিতে সার প্রয়োগ

আমরা আগেই সার m¤ú‡K জেনেছি। এবারে সার প্রয়োগে নিয়মনীতি অনুসরণ না করার সুফল ও কুফল m¤ú‡K জানব।

ফসল উৎপাদনে সারের বিকল্প নেই। কেননা উদ্ভিদের খাদ্যই n‡"Q সার। রাসায়নিক সার cÂv‡ki দশকে এদেশের ফসলে ব্যবহার শুরু হয় আর তখন সার ব্যবহারের কথা বলা হলে চাষিরা চমকে উঠতেন। কৃষি বিভাগের তৎপরতার কারণে এ ভীতি অনেক কমে এসেছে। কিন্তু আজও দেখা যায় চাষিরা ফসলের জমিতে সার ব্যবহারের নিয়মনীতি না মেনে অনেকেই পরিমাণের চেয়ে বেশি/কম সার প্রয়োগ করে থাকেন। কাজেই গাছের বৃদ্ধি, ফুল-ফল ধারণ ও মাটিকে উর্বর রাখতে হলে মাটি পরীক্ষা করে সুষম সার ব্যবহার করতে হবে। কারণ মাটি পরীক্ষা না করে সার ব্যবহার করলে–

(১) একদিকে যেমন উৎপাদন কম হয় অন্যদিকে খরচ বাড়ে; (২) এছাড়া মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ নষ্ট হয়;

আবার, সুষম সার প্রয়োগে–

(১) মাটিতে পুষ্টি উপাদান যোগ হয়; (২) মাটি উর্বর হয়;

মাটিতে সার ব্যবহারের আগে করণীয়

আমরা এতক্ষণ সারের ব্যবহার m¤úK জানলাম। এসো এবার সার ব্যবহারের আগে করণীয় m¤úK জেনে নেই। বছরের যেকোনো সময় ফসল চাষ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আগে থেকেই জেনে নিতে হবে–

১. মাটি পরীক্ষা করে মাটির গুণাগুণ m¤úK জানতে হবে। অর্থাৎ মাটিতে কোন পুষ্টি উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জানতে হবে;

২. পরীক্ষিত মাটিতে কোন ফসল চাষ করা যাবে তা জানতে হবে;

৩. ফসলভিত্তিক সারের চাহিদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নির্দেশনা থেকে জেনে নিতে হবে;

৪. ঐ জমিতে ceeZx কী ফসল চাষ করা হয়েছে এবং তাতে কী কী সার ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে হবে।

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পরিমিত সার ব্যবহারের সুফল ও কুফল m¤úK দলীয়ভাবে প্রতিবেদন লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রতিবেদনগুলো সংগ্রহ ও gj¨vqb করবেন।

পাঠ–৫ : রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রয়োগ পদ্ধতি

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অল্প জমিতে বেশি ফলন পেতে হলে রাসায়নিক সার ব্যবহারের বিকল্প নেই। এখন প্রশ্ন n‡"Q কীভাবে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমানো যায়, পাশাপাশি ফলন বেশি পাওয়া যায়।

প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতির ওপরই প্রয়োগকৃত সারের কার্যকারিতা বাড়ে। এটি নাইট্রোজেন সারের জন্য বিশেষভাবে ¸iZcY| কেননা পানিতে সহজে দ্রবণীয় বলে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে প্রয়োগকৃত নাইট্রোজেনের প্রায় ৭০% নানাভাবে মাটি থেকে a‡q ফসলের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে এবং পরিবেশকেও `¨IZ করে। যেমন :

১. ইউরিয়া সার মাটিতে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং মৌসুম শেষে মাটিতে তা একেবারেই অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই ইউরিয়া সার ফসলের চাহিদামাফিক গাছের আংশিক বৃদ্ধির ধাপে ধাপে wK¯—‡Z প্রয়োগ করতে হয়;

২. জমিতে সবুজ সার তৈরির পর (হেক্টর প্রতি ১২-২৫ টন সবুজ ˆaÂ¨) ধান ফসলের নাইট্রোজেন সারের মাত্রা ১৫-২০ কেজি/হেক্টর কমানো যায়;

৩. শুটি জাতীয় দানা ফসল চাষের পর (যদি ফসলের পরিত্যক্ত অংশ মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়) তাহলে নাইট্রোজেন সারের প্রয়োগ মাত্রা ৮-১০ কেজি/হেক্টর কমানো যায়;

৪. এলসিসি (Leaf Color Chart) ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ধানের ফলন ঠিক থাকে এবং হিসাব করে দেখা গিয়েছে রোপা আমন ধানে শতকরা ২৫ ভাগ এবং বোরো ধানে শতকরা ২৩ ভাগ ইউরিয়া সার কম লাগে (mÎ - কৃষিকথা, বৈশাখ ১৪১৭)

৫. ইউরিয়া সার গুটি আকারে ফসলের জমিতে প্রয়োগ করলে ২৫% ইউরিয়া সাশ্রয় হয়।

সাশ্রয়ীরূপে সার প্রয়োগের পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা সারের ব্যবহার কমানোর উপায়গুলো আলোচনা করলাম। এবার এসো সাশ্রয়ীরূপে প্রয়োগের নিয়মগুলো জেনে নিই। এক্ষেত্রে শিক্ষক সম্ভব হলে সাশ্রয়ীরূপে সার প্রয়োগের ওপর একটি ভিডিও চিত্র দেখাতে পারেন।

১. রাসায়নিক সার কোনো বীজ, গাছের কাণ্ডের খুব কাছাকাছি বা কোনো ভেজা কচিপাতার ওপর ব্যবহার করা যাবে না;

২. ধানের কাদাময় জমিতে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। তবে শুকনো জমিতে প্রয়োগের পর নিড়ানি বা আঁচড়া দিয়ে মাটির সাথে মেশাতে হবে;

৩. জৈব সার, টিএসপি ও এমপি বীজ বপন বা চারা রোপণের আগে প্রয়োগ করতে হবে;

৪. বেলে মাটিতে এমপি ও ইউরিয়া সার কয়েক wKw¯— উপরি প্রয়োগ করলে সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

৫. ধানের প্রথম কুশি বের হওয়ার সময়, কাইচ থোড় জন্মের কয়েকদিন আগে এবং গমে মুকুট শিকড় বের হলে, ভুট্টার চারা যখন হাঁটুসমান উঁচু হয় এবং ¯¿x ফুল বের হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সার উপরি প্রয়োগ করা দরকার।

৬. বোরো ধানের বেলায় ১ গ্রাম ওজনের ৩টি এবং রোপা আমনের ক্ষেত্রে ২টি গুটি ইউরিয়া পুঁতেতে হয়। চারা রোপনের ৫-৭ দিন পর দু'সারির কাছাকাছি চার গোছার মাঝখানে মাটির ৭.৫০-১০ সে.মি. বা ৩-৪ BwÂ নিচে গুটিগুলো প্রয়োগ করা দরকার। মাটির ওপর যখন পানি থাকবে না তখনই গুটি প্রয়োগ করতে হবে;

৭. জমি তৈরির শেষ চাষে পটাশ, গন্ধক ও `¯Ív জাতীয় সারগুলো প্রাথমিকভাবে একবারে প্রয়োগ করা যায়;

কাজ : শিক্ষক দলগতভাবে শিক্ষার্থীদের "সাশ্রয়ীরূপে জমিতে সার ব্যবহারের নিয়মাবলি" m¤ú‡K একটি পোস্টার পেপার অঙ্কন করতে বলবেন। শিক্ষক দলনেতার মাধ্যমে তা উপস্থাপনের ব্যবস্থা করবেন।

অথবা

কাজ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দ্বারা একটি বিতর্কের ব্যবস্থা করবেন। বিতর্কের বিষয়– "রাসায়নিক সারের পরিমিত ব্যবহারে ফসলের ফলনের তারতম্য হয় না?" শিক্ষক বিতর্কটি gj¨vqb করবেন।

পাঠ ৬ ও ৭ : জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহার

ফসল উৎপাদনে পানির চাহিদা ci‡Y কৃত্রিম উপায়ে পানি প্রয়োগকে পানি সেচ বলে। সেচের পানির gj উৎস বৃষ্টিপাত। বৃষ্টিপাতের পানি নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, হ্রদ, পুকুর ইত্যাদিতে জমা হয় বা চলাচল করে। এ সব পানির অংশবিশেষ f-M‡f জমা হয়। সেচের জন্য অবস্থান অনুসারে পানির উৎস দুই প্রকার; ক) f-cÖi¯' পানি; যেমন–নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানি ও খ) f-Mf¯' পানি। বিভিন্ন ধরনের সেচ প্রযুক্তি যেমন–গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শক্তিচালিত cv¤ú, ভাসমান cv¤ú ইত্যাদি ব্যবহার করে পানি উত্তোলন করে সেচ দেওয়া হয়। পানি উত্তোলনের পর কাঁচা বা পাকা সেচ নালার মাধ্যমে জমিতে দেওয়া হয়। দেশের মোট কৃষি জমির ৫২ শতাংশ সেচের আওতাভুক্ত। ১৪.৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে f-উপরিস্থ সেচ এবং ৩৩.৭৩ লক্ষ হেক্টর জমি f-গর্ভস্থ সেচের আওতাভুক্ত। আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট-এর এক জরিপে দেখা যায় আমাদের দেশে সেচ দক্ষতা ৩০-৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ সেচের জন্য দেওয়া পানির ৬৫-৭০ ভাগই অপচয় হয়। সেচ cv¤ú ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, সেচ নালা নির্মাণ ও মেরামত এবং সেচ cv¤ú পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, ডিজেল, পেট্রোলের জন্য প্রতি বছর অনেক টাকা খরচ হয়। বোরো ধানের মোট উৎপাদন খরচের ২৮-৩০ শতাংশ সেচের জন্য খরচ হয়। আবার অতিমাত্রায় f-গর্ভস্থ সেচ পানি ব্যবহারের ফলে পানির ¯—i নিচে নেমে hv‡"Q যা পরিবেশগত দিক থেকে SwKcY| সুতরাং gj¨evb সেচের পানির অপচয় হ্রাস করে জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহার বাড়াতে হবে।

ফসলের চাহিদা অনুসারে জমি থেকে পানিপ্রাপ্তি ভালো ফলনের cekZ| জমিতে পানির ঘাটতি দেখা দিলে সেচের মাধ্যমে ফসলের চাহিদা অনুসারে পানি সরবরাহ করতে হয়। প্রয়োজনের বেশি বা কম পানি উভয়ই শস্যের ফলন বৃদ্ধির অন্তরায়। বেশি পানি সেচ দিলে অনেক ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সুতরাং শস্যে সেচ প্রয়োগের আগে সেচের সঠিক সময় ও প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ m¤ú‡K ধারণা থাকতে হবে। বিভিন্ন ফসলের পানির চাহিদা বিভিন্ন। ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়েও পানির চাহিদার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শস্যে কখন সেচ দিতে হবে তা নানাভাবে নির্ধারণ করা যায়। সব পদ্ধতিই আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে msMwZcY নয়। জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচের ব্যবহারের জন্য নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে–

ক) সেচ নালার ধরন : সেচ নালা বা ক্যানালের মাধ্যমে জমিতে সেচের পানি পরিবহন করা হয়। কাঁচা সেচ নালায় পানি পরিবহনে বেশি অপচয় হয়। আবার যদি কাঁচা সেচ নালা সঠিকভাবে তৈরি করা না হয় তাহলে অপচয় আরও বেশি হয়। জমি থেকে উঁচু করে সেচ নালা তৈরি, নালার দুই পাশ ও তলা পিটিয়ে মজবুত করলে পরিবহনের সময় সেচের পানির অপচয় হ্রাস পায়।

খ) সেচ পদ্ধতি : ফসলের প্রকার, fwgi বন্ধুরতা, মাটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের সেচ পদ্ধতি রয়েছে। আমরা সপ্তম শ্রেণিতে বিভিন্ন সেচ পদ্ধতি m¤ú‡K জেনেছি। নিচে পানি সাশ্রয়ী কয়েকটি সেচ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. চেক বেসিন পদ্ধতি : প্লাবন সেচ পদ্ধতিতে জমিতে পানি নিয়ন্ত্রণের কোনো সুযোগ থাকে না। ফলে পানির অপচয় বেশি হয়। এ অসুবিধা `i করার জন্য চেক বেসিন পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। চেক বেসিন পদ্ধতিতে mg¯— জমিকে ঢাল অনুসারে কয়েকটি খণ্ডে উঁচু আইল দ্বারা বিভক্ত করে পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সেচ দেওয়া যায়।

২. রিং বেসিন পদ্ধতি : ফল বাগানে রিং বেসিন বা বৃত্তাকার পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানির অপচয় কম হয়। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ফল গাছের গোড়ায় বৃত্তাকার নালা তৈরি করে প্রধান সেচ নালার সাথে সংযোগ দেওয়া হয়।

৩. নালা পদ্ধতি : নালা সেচ পদ্ধতিতে জমির আয়তন অনুসারে পর্যাপ্ত সংখ্যক নালা তৈরি করে প্রধান সেচ নালার সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। সারি ফসলে এ পদ্ধতি বেশি উপযোগী। এ পদ্ধতিতে পানি নিয়ন্ত্রণ সহজ বলে অপচয় কম হয়।

৪. বর্ষণ সেচ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নজলের মাধ্যমে পানি গাছের উপর বৃষ্টির মতো ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পানি সাশ্রয়ী এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক খরচ বেশি। চা বাগানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৫. ড্রিপ সেচ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পানি পাইপের মাধ্যমে গাছের gj\Â‡j পৌঁছে দেওয়া হয়। এটা সবচেয়ে পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতি। যেখানে সেচের পানির খুব অভাব সেখানে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

> **শ্রেণির কাজ :** শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে অতিরিক্ত সেচের কুফল m¤ú‡K আলোচনা করবে। আলোচনা শেষে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

গ) সেচের পানির পরিমাণ : গাছ gj\Âj হতে পানি গ্রহণ করে। গাছের বৃদ্ধির সাথে gj বৃদ্ধি পায় ও মাটির গভীরে প্রবেশ করে। তাই সেচের মাধ্যমে গাছের gj\Âj ভিজাতে হয়। বেশির ভাগ ফসলের ৮০-৯০ শতাংশ gj lপরের প্রথম এক থেকে দেড় ফুট মাটির গভীরে থাকে। গাছের মোট পানির ৭০ শতাংশ gj\Â‡ji প্রথমার্ধ থেকে গ্রহণ করে। তাই মাটির প্রথম এক থেকে দেড় ফুট গভীরতা পর্যন্ত ভিজিয়ে পানি সেচ দিতে হবে।

ঘ) সেচ দেওয়ার সময় : সেচের পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের জন্য সঠিক সময়ে সেচ দিতে হবে। সঠিক সময়ে সেচ দেওয়ার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়–

১. মাটিতে রসের অবস্থা : মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে জমিতে সেচ দিতে হবে। জমিতে রসের পরিমাণ জানার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সহজ একটি পদ্ধতি হলো হাতের সাহায্যে অনুভব করে মাটির রসের অবস্থা বুঝে সেচ দেওয়া। যে জমিতে সেচ দিতে হবে ঐ জমির একটি স্থানে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের গভীরতা ফসলের শিকড়ের গভীরতার তিন ভাগের দুই ভাগের সম পরিমাণ হবে। এবার গর্তের তলা থেকে মাটি তুলে হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিয়ে গোলাকার বল তৈরি করতে হবে। যদি মাটি শুকনা ও ধুলা, বল তৈরির সময় আঙুলের ফাঁক দিয়ে গুঁড়ো হয়ে বের হয়ে যায় বা বল তৈরি হলেও তা ফেলে দিলে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, তাহলে জমিতে অতি সত্বর সেচ দিতে হবে। মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে দলা হবে কিন্তু ফেলে দিলে দলা ভাঙবে না, এমন অবস্থায় ১-২ দিন পর জমিতে সেচ দিতে হবে। মাটি হাতের মুঠোয় নিয়ে চাপ দিলে ভিজা দলা তৈরি হবে, হাতের তালু ভিজে যাবে এবং দলা ফেলে দিলে ভাঙবে না, এ অবস্থায় ৩-৪ দিন পর পুনরায় মাটির রস পরীক্ষা করতে হবে। আর যদি মাটি কাদাময়, হাতে চাপ দিলে কাদা মাটি আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে, তালু ভিজে যায় কিন্তু পানি বেরিয়ে আসে না, এমতাবস্থায় সেচ দিতে হবে না। ৭ দিন পর জমি আবার পরীক্ষা করতে হবে।

২. ফসলের বৃদ্ধি পর্যায় : ফসলের শারীরতাত্ত্বিক বৃদ্ধির সকল পর্যায়ে সমানভাবে পানির প্রয়োজন হয় না। যে সকল পর্যায়ে মাটিতে পানি স্বল্পতায় ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাকে সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায় বলে। আর যেসব পর্যায়ে পানির অভাবে ফসলের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় তাকে সংকটময় পর্যায় বলে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা বিষয় শিকের সহায়তায় জমিতে সাশ্রয়ীরূপে সেচ ব্যবহারে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে পোস্টার তৈরি করবে।

নিচের ছকে প্রধান প্রধান ফসলের সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় chvqmgn দেখানো হলো :

ফসলের নাম	সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায়	সেচের প্রতি সংকটময় পর্যায়
ধান	প্রাথমিক কুশি গজানো, শীষ গজানো, c®úvqb, দুধ পর্যায়	প্রাথমিক c®úvqb, c®úvqb
গম	gKU gj MRv‡bv, Kwk MRv‡bvi †kl w`‡K, c®úvqb	c®úvqb, দুধ পর্যায়
সরিষা	দৈহিক বৃদ্ধি ও c®úvqb	c®úvqb
ছোলা	c®úvqb-ce ও বীজ গঠন	c®úvqb-ce
আলু	চারা গজানো, স্টোলন তৈরি, প্রাথমিক কন্দ গঠন, কন্দের ওজন অর্জন পর্যায়	চারা গজানো, প্রাথমিক কন্দ গঠন

ফসলের সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় পর্যায়ে জমিতে রসের ঘাটতি হলে সেচ দিতে হবে। এভাবে সেচ দিলে অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হবে না।

ধান বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য। দেশের মোট জমির প্রায় ৭৫ শতাংশ জমিতে ধান চাষ হয়। বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদিত হয়। আর এ মৌসুম বৃষ্টিহীন থাকায় সবচেয়ে বেশি পানি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সেচ পদ্ধতিতে ধানের জমিতে ১০-১৫ সে.মি. দাঁড়ানো পানি রাখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে ৩০০০-৫০০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। যা প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে ধান চাষে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি হিসেবে পর্যায়ক্রমিক ভেজানো ও শুকানো (Alternate Wetting and Drying) পদ্ধতি জনপ্রিয় করা n‡"Q| এ পদ্ধতিতে সব সময় জমিতে দাঁড়ানো পানির প্রয়োজন নেই। জমিতে একটি পর্যবেক্ষণ নল স্থাপন করে সেচের সময় নির্ধারণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে পানি, জ্বালানি, ও শ্রমিক খরচ সাশ্রয় হয়। ৩০-৩৭ ভাগ সেচের পানি কম লাগে, ২৯ ভাগ ডিজেল কম লাগে এবং ধানের ফলন ১২ ভাগ বেশি হয়। সর্বোপরি এটি একটি পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি।

কাজ :

শিক্ষার্থীরা 'জমিতে অতিরিক্ত সেচের প্রভাবে' কী ক্ষতি হতে পারে সে m¤ú‡K প্রতিবেদন লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শিখলাম : f-উপরিস্থ পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, সেচ দক্ষতা, চেক বেসিন পদ্ধতি, বর্ষণ সেচ পদ্ধতি, ড্রিপ সেচ পদ্ধতি, গাছের gjvÂj, সেচের প্রতি সংবেদনশীল ও সংকটময় পর্যায়।

পাঠ ৮ : ভালো উন্নত বীজ নির্বাচন

বীজ একটি মৌলিক কৃষি উপকরণ। বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের বংশ we¯Ívi ঘটে। উদ্ভিদ বিজ্ঞান অনুযায়ী, পরিপক্ব নিষিক্ত ডিম্বককে (mature fertilized ovule) বীজ বলে। আমরা জানি উদ্ভিদের অন্যান্য অঙ্গ

ব্যবহার করেও বংশ we¯Ívi সম্ভব। কৃষিতত্ত্ব এগুলোকেও বীজ হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এগুলোকে কৃষিবিদগণ কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বলেন আর নিষিক্ত পরিপক্ব ডিম্বককে বলা হয় সত্যিকার বীজ (true seed) বা যৌন বীজ (sexual seed) বীজের মাধ্যমে উদ্ভিদের জাতের গুণাগুণ পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। অজ্ঞাজ প্রজননে মাতৃ উদ্ভিদের, অর্থাৎ যে উদ্ভিদের অঙ্গ ব্যবহার করা হলো তার, ফসল গুণাগুণের cY প্রকাশ ঘটতে পারে। অপর দিকে যৌন বীজে মাতা ও পিতা উদ্ভিদ উভয়ের গুণের একটি যৌক্তিক মিশ্রণ নিয়মানুসারে ঘটে। এ ক্ষেত্রে অসুবিধা এই যে আত্ম-নিষিক্ত (self fertilized) না হলে, অর্থাৎ অন্য একটি গাছের ফোটা ফুলের রেণু দ্বারা নিষিক্ত হলে, মা গাছের সকল গুণাগুণ পরবর্তী প্রজন্মে নাও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সুবিধাও আছে। সুবিধা এই যে পরিকল্পিতভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে দুইটি আলাদা জাতের (একই ফসলের) মধ্যে সংকরায়ণ (hybridization) ঘটিয়ে তৃতীয় জাতের সৃষ্টি করা যায় যাতে মাতার কিছু এবং পিতার কিছু ভালো গুণের সমাহার ঘটতে পারে। এইভাবে বীজের বংশগতিগত (genetic) উন্নয়ন সম্ভব, যাকে বলা হয় সংকরায়ণ (hybridization)।

কৃষক চাষাবাদের জন্য উন্নত গুণাগুণm¤úb D"P ফলনশীল জাতের উন্নত বীজ ব্যবহার করে লাভবান হতে চায়। কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলো বীজ উন্নয়নের কাজ করে, বীজ প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ উন্নতজাতের বীজের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় এবং বি.এ.ডি.সি (BADC)-এর মতো রাষ্ট্রীয় কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বিভিন্ন স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহ করে।

চলতি কোনো ফসলের জাতের প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কিছু কাঙ্ক্ষিত গুণের ভিত্তিতে ক্রমাগত বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও বীজের উন্নতি বা জাতের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে উন্নয়নকে বলা হয় চয়ন-প্রজনন (selection breeding)। পর্যবেক্ষণ ও বাছাই এখানে gj কৌশল। সংকরায়ণের পরও বেশ কয়েক প্রজন্ম (generation) পর্যবেক্ষণ ও বাছাই করা হয়।

চাষি পর্যায়ে উন্নত বীজ নির্বাচনের আগে আরও কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। যেমন :

১। চাষির কৃষি পরিবেশ AÂ‡ji জন্য ফসলের কোন কোন জাত উপযুক্ত।

২। ঐ জাতগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে কম সময়ে ফলন দেয়।

৩। ঐ জাতগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশি ফলন দিতে পারে।

৪। কোন জাতটির রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা Zjbvgjk বেশি।

৫। কোন জাতটির মাঠ পরিচর্যা সহজতর।

কিন্তু উন্নত জাতের বীজ হলেই D"P ফলন পাওয়া নিশ্চিত হয় না যদিও D"P ফলনশীলতা উন্নত জাতের একটি গুরুতcY গুণ। চাষির প্রয়োজন "উন্নত জাতের ভালো বীজ"।

ভালো বীজের আরও কিছু ভালো গুণ থাকা প্রয়োজন যেমন–

১। মিশ্রণহীন বীজ

২। অন্তত ৮০% অঙ্কুরোদ্গমন ক্ষমতা

৩। চারার D"Pgv‡bi সতেজতা

৪। cwi"QbZv

৫। সুস্থ বীজ (রোগজীবাণুর দূষণ ও সংক্রমণমুক্ততা)

সহজ দ্রুত ও বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের উলিখিত গুণগুলো আছে কি না তা নির্ধারণ করা যায়। এই গুণগুলোর ঘাটতি থাকলে তথাকথিত "উন্নত" বীজ ও D"P ফলন দিতে ব্যর্থ হয়। তাই উন্নত ভালো বীজ নির্বাচন D"P ফলন পাওয়ার গুরুত্বcÝ শর্ত।

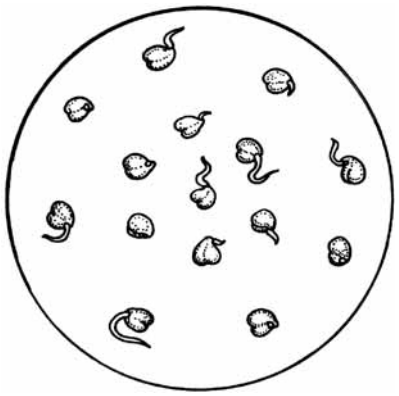

চিত্র : বটার পরীক্ষা

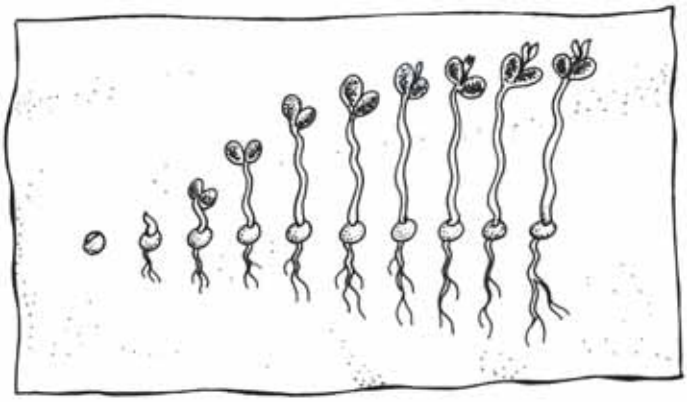

চিত্র : পেপার টাওয়েল পরীক্ষা

বীজের অঙ্কুরোদ্গমন এবং চারার সতেজতা পরীক্ষা
এসব কারণে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন, ক্রয় ও ব্যবহার করা উচিত।

কাজ
শিক্ষার্থীরা উন্নত ও সুস্থ বীজ নির্বাচন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ mg¤ú‡K দলগতভাবে আলোচনা করে পয়েন্ট আকারে পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন করবে।

পাঠ-৯ : বীজ সংরক্ষণ

উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে ভালো বীজও খারাপ হয়ে যেতে পারে। e¯Í‡e সংরক্ষণ বিষয়টি সত্যিকারের বীজ (true seed) এর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বেশি। সঠিক কৌশলে বীজ সংরক্ষণ করলে ভালো বীজের যে গুণাগুণগুলো ceeZx পাঠে উলেখ করা হয়েছে সেগুলো অক্ষুণ্ন রেখে বছরের পর বছর ব্যবহারযোগ্য রাখা যায়।

ভালো উন্নত বীজ সংরক্ষণ কলাকৌশল : বীজ ফসল (seed crop) নির্বাচন মাঠে থাকতেই শুরু করতে হয়। বীজ ফসল মাঠে থাকতেই সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বীজ ফসলে রোগ সংক্রমণ না হয় এবং অন্য কোনো বালাই আক্রান্ত না হয়।

পরিপক্ব হওয়া মাত্র এই বীজ সংগ্রহ করে ঝাড়া বাছা শুকানো এমন যত্ন সহকারে করা উচিত যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। খোলা বাতাসে রৌদ্রে শুকানো যেতে পারে। প্রত্যেক ফসলের জন্য বীজ শুকানোর আলাদা মান থাকতে পারে। অর্থাৎ বীজের আর্দ্রতার নির্দিষ্ট নিরাপদ মাত্রা রয়েছে। ধান, গম বীজের জন্য এই আর্দ্রতার মাত্রা বীজের ৮ থেকে ১০%।

খুব বেশি শুকালে বীজ ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে এবং বীজের ভ্রূণের ক্ষতি হতে পারে। আবার বীজ নিরাপদ আর্দ্রতার মাত্রার কম শুকালে সহজেই জীবাণু সংক্রমণ ঘটতে পারে এবং পোকার আক্রমণ ঘটতে পারে।

গুদামজাত বীজ কতটা এবং কত সময় ভালো থাকবে তার ওপর আর্দ্রতা নিয়ামক প্রভাব রাখে। বীজের আর্দ্রতা ছাড়াও যে পাত্রে বীজ রাখা হবে তার অভ্যন্তরের এবং যে গুদামে বীজভরা পাত্রগুলো রাখা হবে তার অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা ও প্রভাব রাখতে পারে। তবে যদি বীজ রাখার পাত্রটি এমন হয় যার ভেতর বায়ু প্রবেশ করতে বা বের হতে পারে না তাহলে ভালো বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

আর্দ্রতা ছাড়া যে সকল প্রভাবক বীজের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো হলো D"P তাপ, তীব্র রশ্মি ইত্যাদি। তবে বায়ুরোধক পাত্রে উপযুক্ত মাত্রায় শুকানো বীজ রাখলে এগুলোর প্রভাব তেমন পড়ে না। তবু পাত্রে সংগৃহীত বীজ অন্ধকার শীতল জায়গায়, ইঁদুর, পোকামাকড়, এসবের উপদ্রবের থেকে সুরক্ষিত স্থানে গুদামজাত করা উচিত। কোল্ড স্টোরে বীজপত্র রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে কোল্ড স্টোরের ভেতর আলাদা এলাকা নির্দিষ্ট থাকা দরকার। সংরক্ষিত বীজের পরিমাণ কম হলে (যেমন শাক-সবজি-ফুলের বীজ) বীজের প্যাকেট বা কৌটার গায়ে পরিচয় লিখে রেফ্রিজারেটরে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের জন্য বীজ সংগ্রহের আগেই জেনে নিতে হবে ঐ বীজ থেকে নতুন ফসল হবে কি না।

পাঠ- ১০ : ধানবীজ সংরক্ষণের ধাপ

১। বীজের জন্য ধান পৃথক পটে বিশেষ পরিচর্যায় উৎপাদন করা ভালো। এই পটে নির্ধারিত পরিমাণে রুটিনমাফিক বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে এবং কঠোর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা (sanitation) পালন করতে হবে।

২। ধান পাকা মাত্রই তা কম খড়সহ যত্নের সাথে শুকাতে হবে, আঁটি বেঁধে মাড়াইখোলায় নিয়ে আসতে হবে এবং সম্ভব হলে ঐ দিনই মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকানো শুরু করতে হবে।

৩। বীজ ধান ঠিকমতো শুকানো হলো কি না দাঁতে কেটে পরীক্ষা করা যায়। দাঁতে একটি ধান কাটতে গেলে যদি ধান দাঁতে বসে যায়, তাহলে আরও শুকাতে হবে। শুকানো ধান দাঁতে কাটতে গেলে "কট শব্দ করে" ভেঙে যাবে। এ ছাড়া বীজ ধানের ¯‘‡c বীজের আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েও বীজের আর্দ্রতা মাপা যায়।

চিত্র : ড্রামে রাখা বীজ

৪। বীজপাত্রে তোলার আগে ছায়াযুক্ত স্থানে কিছুক্ষণ রেখে বীজ ঠাণ্ডা করে নেওয়া প্রয়োজন।

৫। বীজপাত্র cY করে বীজ রাখা ভালো।

৬। বীজপাত্রের গায়ে বীজের পরিচয়, পাত্রস্থ করার তারিখ, কোনো রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়েছে কি না, যিনি বীজ সংরক্ষণ করলেন তাঁর স্বাক্ষর দেওয়া প্রয়োজন।

মরিচের বীজ সংরক্ষণের ধাপ

১। সুস্থ সবল গাছ থেকে সতেজ, রোগ লক্ষণহীন পাকা মরিচ পরিমাণমতো সংগ্রহ করতে হবে।

২। সতেজতা থাকতেই মরিচ ফলগুলো ভেঙে পরিষ্কার পাত্রে সাবধানে বীজ বের করে নিতে হবে। যাতে বীজ ছিটকে চোখে না লাগে।

৩। সংগ্রহ করা বীজগুলোর মধ্যে অপুষ্ট, রোগ লক্ষণযুক্ত, অস্বাভাবিক বীজ থাকলে তা বাছাই করে ফেলে ঐ পাত্রেই রোদে শুকাতে হবে। কড়া রোদে ২ ঘণ্টা শুকালেই যথেষ্ট। এক ঘণ্টা পর একটি কাঠি বা চামচ দিয়ে নেড়ে দেওয়া ভালো।

৪। শুকানোর পর পাত্রে রাখার আগে বীজ ঠান্ডা করে নিতে হবে। কম বীজ সংরক্ষণের জন্য জিপারযুক্ত পাস্টিক ব্যাগ সর্বোত্তম। পাওয়া না গেলে পলিথিন ব্যাগে নিয়ে ব্যাগ সিল করে দিতে হবে।

৫। বীজের প্যাকেটগুলোতে লেবেল লাগাতে হবে।

৬। ছোট ছোট বীজের প্যাকেটগুলো একটি বড় স^"Q বয়ামে ভরে বয়ামটি একটি নিরাপদ শুকনো ঠান্ডা স্থানে রাখতে হবে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. ধানের বীজতলা ..... ভাবে তৈরি করা যায়।

২. ফসল উৎপাদনের ..... বিকল্প নেই।

৩. ফসলের জমিতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সরবরাহকে ..... বলে।

৪. ..... একটি মৌলিক কৃষি উপকরণ।

বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

বামপাশ	ডানপাশ
১. বীজ ফসল নির্বাচন শুরু করতে হয়	গাছের gj¥Âj
২. সেচের মাধ্যমে ভেজাতে হয়	পরিবেশ নষ্ট হয়
৩. মাটি পরীক্ষা না করে সার ব্যবহার	সরাসরি
৪. শুকনো বীজতলায় বীজ বপন করা যায়	পরিবেশ সুন্দর থাকে
	মাঠে থাকতে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণত ফল বাগানে কোন ধরনের সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

ক. চেক বেসিন
খ. রিং বেসিন
গ. বর্ষণ বেসিন
ঘ. ড্রিপ বেসিন

২. ধান চাষে সেচের প্রতি সংবেদনশীল পর্যায়-

i. c®úwq‡bi সময়
ii. শীষ গজানোর সময়
iii. বীজ গঠনের সময়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

পলাশ নার্সারি তৈরির উদ্দেশ্যে ভালুকায় তাঁর গ্রামের বাড়িতে ১০টি বেড তৈরি করেন। বেড তৈরির সময় তিনি জৈব ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের পাশাপাশি চুন প্রয়োগ করেন।

৩. তৈরীকৃত বেডের জন্য কত কেজি এমপি সার প্রয়োজন?

ক. ১ কেজি

খ. ২ কেজি

গ. ৩ কেজি

ঘ. ৪ কেজি

৪. বেডে চুন প্রয়োগের কারণ n‡"Q-

i. মাটির অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ

ii. রোগজীবাণু দমন

iii. বীজ দ্রুত গজানো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মোরশেদ মিয়া এলাকায় একজন সচেতন ও সফল চাষি হিসেবে সুপরিচিত। তিনি সব সময়ই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছেন। তিনি এ বছর ৪ হেক্টর জমিতে সবুজ সার তৈরির পর ধানের চাষ করেন এবং ইউরিয়া ব্যবহারে এল সি সি পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

ক. কোন ধরনের মাটিতে ধানের শুকনো বীজতলা তৈরি করা হয়?

খ. চাষ দেওয়ার পর বীজতলা ২-৪ দিন ফেলে রাখতে হয় কেন?

গ. মোরশেদ মিয়া তার জমিতে কী পরিমাণ ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করবেন তা নির্ণয় কর।

ঘ. ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিতে মোরশেদ মিয়ার কার্যক্রম gj¨vqb কর।

২. কবীর সাহেব দীর্ঘদিন ধরে জমিতে সেচের মাধ্যমে ধানের চাষাবাদ করে আসছেন। বর্তমানে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ায় ফসলের উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কবীর সাহেব কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে কবীর সাহেব মাটি পরীক্ষা করে সেচের সময় নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে তার জমিতে পানির পরিমাণ অনেক কম লাগে।

ক. সেচের পানির gj উৎস কোনটি?

খ. ভালোবীজ নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. কবীর সাহেব তাঁর জমিতে সেচের সময় কীভাবে নির্ধারণ করবেন, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফসলের উৎপাদন খরচ কমাতে কবীর সাহেবের উদ্যোগটি gj¨vqb কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদর্শ বীজতলা কাকে বলে?

২. সেচ কী?

৩. বীজ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝায়?

৪. চয়ন প্রজনন কাকে বলে?

রচনামলক প্রশ্ন

১. বীজতলার মাটি প্রস্তুতির নিয়মাবলি লেখ।

২. সার প্রয়োগের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩. চাষ পর্যায়ে বীজ নির্বাচনের আগে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয় তা লেখ।

৪. ধানবীজ সংরক্ষণের ধাপগুলো বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

কৃষি ও জলবায়ু

এ অধ্যায়ে প্রথমে c‖ZKj পরিবেশ কী, c‖ZKj পরিবেশে কৃষি উৎপাদনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে c‖ZKj পরিবেশ যেমন– খরা, লবণাক্ত ও বন্যা প্রবণ এলাকার শস্য, মৎস্য ও পশুপাখির উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদনে বিরূপ আবহাওয়া কী, বিরূপ আবহাওয়া যেমন– জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি থেকে শস্য, মৎস্য ও পশুপাখি রক্ষার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

চিত্র : বন্যা

চিত্র : শিলাবৃষ্টি

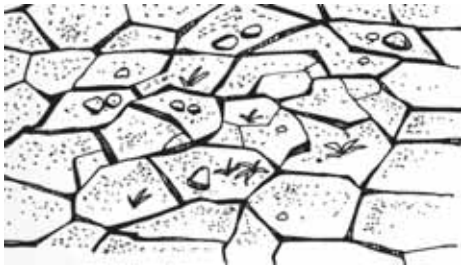

চিত্র : খরা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- c‖ZKj পরিবেশে কৃষিজ উৎপাদনের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- বিরূপ আবহাওয়া থেকে কৃষি উৎপাদনকে রক্ষায় কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের কৌশল বিশেষণ করতে পারব।

পাঠ ১ : ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ

জলবায়ু ও পরিবেশগত উপাদান স্বাভাবিক থাকলে ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তবে প্রকৃতিতে কিছু কিছু AÂ‡j ফসলের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সব সময় স্বাভাবিক পরিবেশ বিদ্যমান থাকে না। এসব AÂ‡j উৎপাদন মৌসুমে ফসলকে জলবায়ু ও পরিবেশগত নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সুতরাং কোনো AÂ‡j যখন জলবায়ু ও পরিবেশগত অবস্থার কারণে ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয় সে

অবস্থাকে c‖ZKj পরিবেশ বলে। এ ধরনের অবস্থায় ফসল জৈব-রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। একে ফসলের অভিযোজন ক্ষমতা বলে।

আমরা জানব জলবায়ু ও পরিবেশগত কোন উপাদানগুলো ফসল উৎপাদনের জন্য c‖ZKj পরিবেশের সৃষ্টি করে? c‖ZKj পরিবেশ সৃষ্টিকারী জলবায়ুগত উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. বন্যা বা জলাবদ্ধতা

২. অনাবৃষ্টি বা খরা

৩. D"P তাপ

৪. নিম্ন তাপ

আর পরিবেশগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে–

১. মাটির লবণাক্ততা

২. মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিকের উপস্থিতি

৩. বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের উপস্থিতি

চিত্র : বন্যা

বাংলাদেশের কৃষিতে c‖ZKj পরিবেশজনিত সমস্যা অনেক আগে থেকেই ছিল। বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে c‖ZKj পরিবেশজনিত সমস্যা আরও বৃদ্ধি c‖‡"Q| জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের কৃষি খাতে ৩টি আশঙ্কাজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে–

১. দেশের DËi-c‖ðg‖Â‡j খরার প্রভাব আরও বৈরী আকার ধারণ করবে

২. DcKj×q AÂ‡j লবণাক্ততা আরও বেড়ে যাবে

৩. দেশে আরও প্রবল বন্যা, N‖YSo প্রভৃতি দেখা দেবে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের DËi-c‖ðg‖Â‡j তাপ বৃদ্ধি c‖‡"Q| বৃষ্টিপাত অনিয়মিতভাবে n‡"Q| বোরো মৌসুমে এবং আমন মৌসুমে খরার মাত্রা বৃদ্ধি c‖‡"Q| বৃষ্টিনির্ভর আমন মৌসুমে সাধারণত চাষিদের সেচ দেওয়ার কোনো cec¯'‖Z থাকে না। ফলে নীরব খরায় ধানের ফলন হ্রাস c‖‡"Q|

বরিশাল ছিল একসময় শস্যভাণ্ডার। এখন সেই বরিশাল খাদ্য ঘাটতি এলাকা। মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে দেশের `‖¶Y-c‖ðg‖Â‡ji ১০ লাখ হেক্টর আমন আবাদি জমি চাষের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।

সারাদেশে ভয়াবহ বন্যায় ২০০৭ সালে দেশের প্রায় ৬০% এলাকা পাবিত হয়। বন্যায় আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার আগেই আবার আঘাত হানে প্রলয়ঙ্করী N‖Yঝড় 'সিডর'। ফসল উৎপাদন ¶‖ZM¯– হয় প্রায় ১৩ লক্ষ টন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে প্রতি বছর অন্তত ১% হারে আবাদি জমি কমে h‖‡"Q| পক্ষান্তরে ১.৩৯% হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে c‖ZKj পরিবেশের মোকাবিলাও করতে n‡"Q| এমতাবস্থায়

বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে আমাদের প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের কলাকৌশল জানতে হবে।

শ্রেণির কাজ : একক কাজ হিসাবে cwZKj পরিবেশে ফসল উৎপাদনের গুরুত্ব খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : cwZKj পরিবেশ, অভিযোজন

পাঠ ২ : খরা অবস্থায় ফসল উৎপাদন কৌশল

ফসল উৎপাদনে প্রাকৃতিক wecwËmg‡ni মধ্যে খরা অন্যতম। বাংলাদেশে প্রায় সব মৌসুমেই ফসল খরায় কবলিত হয়। খরা অবস্থা তখনই বিরাজ করে যখন কোনো নির্দিষ্ট মৌসুমে বৃষ্টিপাত কম হয় বা দীর্ঘদিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। এতে করে মাটিতে রসের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে খরাকবলিত অবস্থা বলা হয়। খরার কারণে ফসলের ১৫-৯০ ভাগ ফলন হ্রাস পেতে পারে। খরা কবলিত AÂ‡j উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল চাষ করলে লাভজনকভাবে ফসল উৎপাদন করা যায়। ব্যবস্থাপনাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. উপযুক্ত ফসল বা ফসলের জাত ব্যবহার : খরা শুরু হওয়ার আগেই ফসল তোলা যাবে এমন স্বল্পায়ু জাতের অথবা খরা সহ্য করতে পারে এমন জাতের চাষ করতে হবে, যেমন– আমন মৌসুমে বিনা ধান ৭, ব্রি ধান ৩৩ এক মাস আগে পাকে। ফলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের খরা থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। আবার আমন মৌসুমের ব্রি ধান ৫৬, ব্রি ধান ৫৭ যেমন স্বল্পায়ু জাত তেমন ২১-৩০ দিন খরা সহ্য করতে পারে। বিজয়, প্রদীপ, সুফী গমের তিনটি খরা সহনশীল জাত। খরা প্রবণ এলাকায় আগাম জাতের আমন চাষ করে ফসল কাটার পর জমিতে রস থাকতেই ছোলা, মসুর, খেসারি, সরিষা, তিল ইত্যাদি খরা সহনশীল ফসল চাষ করে একটি অতিরিক্ত ফসল তোলা যাবে। কুল গাছ খরা সহনশীল বলে এসব AÂ‡j কুল বাগানও করা যেতে পারে।

২. মাটির ছিদ্র নষ্টকরণ : খরা প্রবণ এলাকায় বৃষ্টির মৌসুম শেষ হওয়ার পর মাটিতে জো আসার সাথে সাথে অগভীর চাষ দিয়ে রাখতে হবে। এতে করে মাটির উপরিভাগের mক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে m‡hi তাপে মাটির রস শুকিয়ে যাবে না।

৩. অগভীর চাষ : জমি চাষের সময় মাটির আর্দ্রতা কম মনে হলে জমিকে হালকা চাষ দিতে হবে। প্রতি চাষের পর মই দিয়ে মাটিকে আঁটসাঁট অবস্থায় রাখতে হবে। এতে মাটিতে পানির সাশ্রয় হবে।

৪. জাবড়া প্রয়োগ : শুকনা খড়, লতাপাতা, কচুরিপানা দিয়ে বীজ বা চারা রোপণের পর মাটি ঢেকে দিলে রস সংরক্ষিত থাকে। কারণ m‡hi তাপে পানি ev‡®ú পরিণত হতে পারে না। অনেক দেশে কালো পলিথিন শিটও ব্যবহার করা হয়। এতে আগাছার উপদ্রবও কম হয়।

৫. পানি ধরা : যে AÂ‡j বৃষ্টি খুব কম হয়, সে AÂ‡j বৃষ্টির মৌসুমে জমির বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট নালা বা গর্ত তৈরি করে রাখা হয়। এর ফলে পানি গড়িয়ে জমির বাইরে চলে যায় না। মাটি কর্তৃক mxúY পানি শোষিত

হয়। পানি সংরক্ষণের এ পদ্ধতিকে পানি ধরা বলা হয়। বৃষ্টির মৌসুম শেষ হওয়ার সাথে সাথে জমি চাষ দিয়ে ফসল বুনে সংরক্ষিত এ পানি সফলভাবে ব্যবহার করা যায়।

চিত্র : জাবড়া প্রয়োগ

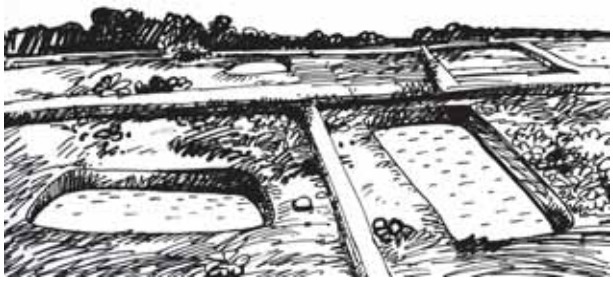

চিত্র : পানি ধরা

৬. আঁচড়ানো : মাটির রস দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকলে বীজ গজানোর পর পর উপরের মাটি হালকা করে আঁচড়ে দিলে মাটির ভিতরে রস সংরক্ষিত থাকে।

৭. সারির দিক পরিবর্তন : খরা প্রবণ এলাকায় mhv‡j v‡Ki বিপরীত দিকে সারি করে ফসল লাগানো উচিত। এতে করে গাছ একটু বড় হলে ফসলের ছায়া দু'সারির মাঝে পড়ে। ফলে মাটিস্থ পানির ev®úxfeb কম হয়। পানির অপচয় কম হয়।

৮. জৈব সার ব্যবহার করা : জমিতে বেশি করে জৈব সার ব্যবহার করলে মাটির গঠন উন্নত হয়, মাটি ঝুরঝুরে হয়। ফলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার খরা এড়াতে পারে এমন বা খরা সহনশীল ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : খরা সহনশীল, জাবড়া প্রয়োগ, পানি ধরা।

পাঠ ৩ : লবণাক্ত AÂ‡j ফসল উৎপাদন কৌশল

এ পাঠে আমরা লবণাক্ত AÂ‡j ফসল উৎপাদন কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। আমরা প্রথম পাঠে জানতে পেরেছি বাংলাদেশের `w¶Yv Â‡j লবণাক্ততা একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা জানি সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। এ AÂ‡ji জমি সমুদ্রের পানি দ্বারা পাবিত হয়। যার কারণে মাটিতে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ক্লোরাইড ও সালফেট লবণের পরিমাণ বেড়ে যায়। মাটিতে লবণের ঘনত্ব বেড়ে গেলে ফসলের মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান ও পানি শোষণ বাধাগ্রস্থ হয়। ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ¶wZM¨ হয়। এ AÂ‡j বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে লবণ ধুয়ে যায় বলে লবণাক্ততা একটু কম থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা আরও বেড়ে যায়। কারণ শুষ্ক মৌসুমে ev®úxfe‡bi মাধ্যমে পানির সাথে লবণ ওপরে উঠে আসে। অনেক এলাকায় মাটির উপরিভাগে লবণের Av¨—i পড়ে যায়। নিচে লবণাক্ত মাটিতে ফসল উৎপাদন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের চাষ : লবণাক্ত AÂ‡j চাষের জন্য আমাদের লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন করতে হবে। উত্তম লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলগুলো হলো– নারিকেল, সুপারি, সুগার বিট, তুলা, শালগম, ^aÂv, পালংশাক ইত্যাদি। মধ্যম লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলগুলো হলো– আমড়া, মিষ্টি আলু, মরিচ, বরবটি, মুগ, খেসারি, ভুট্টা, টমেটো, পেয়ারা ইত্যাদি। গম, কমলা, নাশপাতি কম লবণাক্ততা সহিষ্ণু। লবণাক্ত এলাকায় আমন মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদিত জাত হলো– বিআর ২২, বিআর ২৩, ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান ৪৬, ব্রি ধান ৫৩, ব্রি ধান ৫৪ ইত্যাদি। স্থানীয় আমন জাতের মধ্যে রয়েছে রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল ইত্যাদি। বোরো মৌসুমে চাষের জন্য অনুমোদিত জাত ব্রি ধান ৪৭, ব্রি ধান ৫৫।

২. সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা : জমির চারপাশে আইল দিয়ে ভারী সেচ দিলে মাটিতে দ্রবণীয় লবণ চুঁইয়ে ফসলের gjvÂ‡ji নিচে চলে যায়। আবার gjvÂ‡ji নিচ বরাবর গভীরতায় যদি নিষ্কাশন নালা তৈরি করে জমির পানি বের করে দেওয়া যায় তাহলে gjvÂ‡ji নিচের লবণও ধুয়ে জমির বাইরে চলে যায়। এ অবস্থায় মাটিতে জো আসার সাথে সাথে জমি চাষ দিয়ে ফসল বুনতে হবে। হালকা বুনটের মাটিতে এ পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

৩. পানির ev®úxfeb **হ্রাসকরণ :** লবণাক্ত জমির মাটিতে লবণ ফসলের gjvÂ‡ji নিচে রাখতে পারলে ফসল ভালোভাবে চাষ করা যায়। mhv‡jv‡Ki কারণে ভেজা অবস্থায় মাটির উপরিভাগের ছিদ্রের মাধ্যমে পানির ev®úxfeb হয়। ফলে ev®úxfe‡bi সাথে লবণ মাটির ওপরের দিকে চলে আসে। তাই লবণাক্ত মাটির ওপরের ¯—‡ii ছিদ্র বন্ধ করে দিতে হয়। মাটির উপরিভাগে কোদাল, নিড়ানির সাহায্যে মাটি আলগা করে দিলে ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং লবণ মাটির নিচের ¯—‡iB থেকে যায়। লবণাক্ত এলাকায় মাঠের আমন ধান কেটে নেওয়ার পর জমি ভেজা থাকতেই চাষ দিয়ে রবি ফসল আবাদ করা যায়। তবে বীজ গজানোর বা চারা রোপণের পর ঘন ঘন নিড়ানি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। লবণাক্ত জমিতে প্রতি সেচ বা বৃষ্টিপাতের পর পরই নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন। তাহলে ওপরের ¯—‡i লবণ জমতে পারে না।

৪. সঠিকভাবে জমি তৈরি : আমন ধান কাটার পর যদি রবি ফসল চাষ করতে দেরি হয় তবে সে সময়ে লবণ মাটির ওপর উঠে আসে। তাই তাড়াতাড়ি জমি চাষ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে দেশি লাঙলের চেয়ে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা উত্তম। শেষ চাষের সময় জমি ভালোভাবে সমান করতে হবে। সমান জমিতে বীজ ভালো গজায়। জমি উঁচু নিচু থাকলে নিচু স্থানে লবণ জমতে পারে।

৫. বপন পদ্ধতির পরিবর্তন : লবণাক্ত জমিতে বীজ ছিটিয়ে বুনলে লবণ তাড়াতাড়ি ওপরে আসে এবং বীজ কম গজায়। তাই বীজ গর্ত তৈরি করে মাটির একটু গভীরে বপন করা উচিত। অথবা জমিতে এক মিটার পর পর অগভীর নালা তৈরি করে কয়েক দিন সেচ দিতে হবে। ফলে আইলের মাটির লবণ ধুয়ে নালায় চলে আসবে। এবার আইলের মাটি কোদাল দিয়ে হালকা চাষ দিয়ে বীজ বুনলে ভালো গজাবে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা ২টি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন ফসল ও ফসলের জাতের তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল

পাঠ ৪ : বন্যাপ্রবণ AÂ‡j ফসল উৎপাদন কৌশল

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিবছর বন্যা হয়ে থাকে। তবে কোনো কোনো বছর ভয়াবহ বন্যার কারণে ব্যাপক ফসলহানি হয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে এ দেশে দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ বন্যায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হ্রাস পায়। দেশের DËi-cevÂ‡j পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় বোরো ধান পাকার সময় তলিয়ে যায়। আবার দেশের ga¨vÂ‡ji we¯—Z AÂ‡j আমন ধান রোপণের সময় বা রোপণ পরবর্তী বন্যায় ¶wZM¯— হয়। বন্যার সময় পানির D"PZvার ওপর ভিত্তি করে বন্যাপ্রবণ জমিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন–

১. **মধ্যম উঁচু জমি :** বন্যার সময় পানির D"PZv m‡ev"P ০.৯০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২. **মধ্যম নিচু জমি :** বন্যার সময় পানির D"PZv m‡ev"P ১.৮০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৩. **নিচু জমি :** বন্যার সময় পানির D"PZv m‡ev"P ৩.০০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৪. **অতিনিচু জমি :** বন্যার সময় পানির D"PZv ৩.০০ মিটারের বেশি হয়ে থাকে।

এসব বন্যাপ্রবণ জমিতে মৌসুম ও এলাকাভেদে বোনা আমন, গভীর পানির আমন, রোপা আমন, বোনা আউশ, রোপা আউশ, বোরো ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

এবার দেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদন কৌশল নিয়ে আলোচনা করব। বন্যাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনের জন্য প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, যেমন–

১. বন্যা নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা : বন্যাপ্রবণ এলাকায় বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য নদী বা খালের দুই তীর দিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়। নদী বা খালে স্লুইস গেট নির্মাণ করে পানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে করে পানি ফসলের ক্ষেতে প্রবেশ করতে না পারে। তবে এ সব নির্মাণের আগে পরিবেশগত দিক ভালোভাবে বিবেচনা করতে হয়।

২. কৃষিতাত্ত্বিক ব্যবস্থা : দেশের DËi-cevÂ‡ji ঢল বন্যাপ্রবণ এলাকায় বোরো ধান ওঠার সময় হঠাৎ করে বন্যা দেখা দেয়। এসব AÂ‡j আগাম জাতের বোরো ধান চাষ করে ফসল রক্ষা করা যায়। ব্রি ধান ২৮, ব্রি ধান ৩৬ আগে পাকে বলে এ AÂ‡j চাষ করা উচিত। জানুয়ারি মাসে জমি থেকে পানি বের করে দিয়ে ৬০ দিন বয়সের চারা রোপণ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এসব জাতের ধান ১৪০-১৫০ দিনের মধ্যে পাকে। ফলে এপ্রিলের শেষে সংগ্রহ করে বন্যা এড়ানো যায়। এ AÂ‡j রোপা আমন হিসাবে ব্রি ধান ৫১ ও ব্রি ধান ৫২ দুটি অনুমোদিত বন্যা সহনশীল জাত। এ জাত দুটির ১০-১৫ দিন পানির নিচে ডুবে থাকার ক্ষমতা আছে। DËi-cevÂ‡ji হাওর এলাকায় চাষিরা স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানও চাষ করে থাকে। বাজাইল, ফুলকড়ি, হরিণশাইল ইত্যাদি স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধান চাষিরা মার্চ-এপ্রিল মাসের বৃষ্টির পর পর ছিটিয়ে বুনে দেয়। পরবর্তী সময়ে বন্যার পানির D"PZv বাড়ার সাথে সাথে গাছের D"PZvI বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সে.মি. পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে।

দেশের ga¨vÂ‡j আমন ধান রোপণের আগে বা পরে বন্যা দেখা যায়। অনেক সময় আগাম বন্যার কারণে কৃষকেরা ধানের বীজতলা তৈরি করার জমি পায় না। সে ক্ষেত্রে বাড়ির উঠানে, কোনো উঁচু স্থানে বা ভাসমান বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বীজতলার ওপর কলাপাতা বা পলিথিন শিট বিছিয়ে দিয়ে হালকা কাঁদার প্রলেপ দিয়ে ৫-৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখা বীজ ঘন করে বুনে দিতে হয়। এ পদ্ধতিতে এক বর্গমিটার বীজ

তলায় ২.৫-৩.০ কেজি বীজ বপন করা হয়। একে দাপোগ বীজতলা বলে। দুই সপ্তাহের মধ্যে চারা gj জমিতে বন্যার পানি নেমে গেলে রোপণ করতে হয়। বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হলে নাবি জাতের আমন ধান, যেমন– নাইজারশাল, বিআর ২২, বিআর ২৩ চাষ করা উচিত। দাপোগ পদ্ধতিতে দ্রুত চারা উৎপাদনের আরও একটি উপায় আছে। বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভেজানোর পর একটু ফাটলে e¯—v বা মাটির কলসে ২৪-৭২ ঘণ্টা রেখে দিলে চারা গজিয়ে যায়। এভাবে উৎপাদিত চারা বন্যার পানি নামার সাথে সাথে ছিটিয়ে বপন করা হয়।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার বন্যাপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যায় এমন জাতের ধানের তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : বন্যাসহিষ্ণু ধান, গভীর পানির আমন ধান, দাপোগ বীজতলা

পাঠ ৫ : প্রতিকূল পরিবেশে পশুপাখি উৎপাদন

প্রাণি তার পারিপার্শ্বিক গাছপালা, পুকুর, নদ-নদী, আবহাওয়া ও জলবায়ু ইত্যাদি নিয়ে একটি পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর আচরণ যখন পশুপাখি পালনের উপযোগী থাকে না তখন তাকে প্রতিকূল পরিবেশ বলে। লবণাক্ততা, বন্যা ও খরা পশুপাখি উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পশুপাখির ওপর প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো-

১। প্রতিকূল পরিবেশে পশুপাখির খাদ্যাভাব দেখা যায়।

২। বিশেষ করে বন্যা ও খরার সময় ঘাসের অভাব হয়।

৩। লবণাক্ত জমিতে ফসল ও ঘাস জন্মায় না।

৪। পশুর বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন অনেক কমে যায়।

৫। পশু পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত হয়।

৬। অনেক পশুপাখি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

চিত্র : বন্যার সময় ঘরছাড়া পশু

বন্যার সময় করণীয় : এ সময় পশুপাখিকে কোনো উঁচুস্থানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। যেসব এলাকায় প্রতিবছর বন্যা দেখা দেয় সেখানে কোনো উঁচুস্থানে স্থায়ীভাবে পশুপাখির ঘর তৈরি করতে হবে। বন্যাপীড়িত এলাকায় লেয়ার মুরগির খামার না করে ব্রয়লার বা হাঁসের খামার করতে হবে। কারণ মাত্র ০১ মাস পালন করে ব্রয়লার বাজারজাত করা যায়। বন্যার সময় পশুকে কচুরিপানা, বিভিন্ন গাছের পাতা, ধানের খড়, কলাগাছ ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করতে হবে। দেশি মুরগির জন্য আগেB কিছু গম বা ভুট্টা কিনে রাখতে হবে। কারণ মুরগি পানিতে নামে না। এ সময় ছাগল ও ভেড়াকে কলার ভেলা ও নৌকায় রেখেও কিছুদিনের জন্য পালন করা সম্ভব। বন্যার সময় পশুর রোগ ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। পশুর ঘরে যেন কাদামাটি না জমে

কাজ : শিক্ষার্থীরা এককভাবে "বন্যার সময় পশুপাখি পালন ও রক্ষার উপায়" খাতায় লিখবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বন্যার আগেই পশুকে সম্ভাব্য রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য টিকা প্রদান করতে হবে।

চিত্র : বন্যার সময় কলার ভেলায় ছাগল

চিত্র : খরার সময় গাছের ছায়ায় মানুষ ও পশু

খরার সময় করণীয় : এ সময় প্রকৃতিতে ঘাস উৎপাদন কমে যায়। এ ক্ষেত্রে পশুকে সুবিধামতো বিভিন্ন গাছের পাতা খাওয়াতে হবে। পশুকে অতি গরমের কারণে খোলাস্থানে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। তাই গরমের সময় পশুকে গাছের নিচে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। এ সময় পশুকে প্রচুর খাবার পানি সরবরাহ করতে হবে। অন্যান্য খাদ্যের সাথে দানাজাতীয় খৈল, fwm, ভাত গোলানো মাড় খেতে দিতে হবে। পশুকে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক টিকা প্রদান করতে হবে।

লবণাক্ততা, বন্যা ও খরাপীড়িত এলাকায় পশুর জন্য নেপিয়ার, পারা, জার্মান জাতের ঘাস চাষ করা যায়। তা ছাড়া খরার সময় সংরক্ষিত সবুজ ঘাস, আখের উপজাত, কলাগাছ, ইপিল ইপিল গাছের পাতা ইত্যাদি গো-খাদ্য হিসাবে বেশ উপযোগী। বর্তমানে বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সবুজ এ্যালজিও পশুকে খাওয়ানো n‡"Q| তাই খরার সময় এ নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে।

নতুন শব্দ পরিচিতি : প্রতিকূল পরিবেশ, দানাশস্যের উপজাত ।

পাঠ ৬ : প্রতিকূল পরিবেশে মৎস্য উৎপাদন ও বি¡প আবহাওয়ায় মৎস্য রক্ষার কৌশল

যেসব AÂ‡j সারা বছরই পুকুরে কিছু না কিছু পানি থাকে, বন্যার প্রবণতা কম বা একেবারে নেই; সেই সব এলাকা মাছ চাষের জন্য অধিক উপযোগী। কিন্তু অনেক AÂj রয়েছে সেখানকার পরিবেশ মাছ চাষের জন্য খুব AbKj নয়, যেমন— বন্যাপ্রবণ এলাকায় মাছ চাষ করলে বন্যার সময় চাষের পুকুর ডুবে গিয়ে মাছ ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে। এতে চাষি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে যেসব এলাকায় খরা বেশি সেখানে খরার সময়ে পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় ও মাটির নিচের পানির ¯—i অনেক নেমে যায় বলে মাছ চাষ `রূn হয়ে পড়ে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের D"PZv বৃদ্ধি পাওয়ায় DcKjeZx AÂ‡j লবণাক্ততা ঢুকে পড়ছে gj ভূ-খণ্ডের দিকে। মৌসুমে নদীগুলোর উজানে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় সাগর স্ফীতির জন্য লোনা

পানি নদীর অনেক ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়ছে। ফলে এ mg¯— এলাকার পুকুরের পানিরও লবণাক্ততা বেড়ে hv‡"Q| এতে করে এসব এলাকায় স্বাদু পানির মাছ আর আগের মতো ফলন w`‡"Q না। মৃগেল মাছ লোনা পানি সহ্য করতে পারে না। রুই, কাতলাও আশানুরূপ আকারের হ"Q না। cwZKj পরিবেশই শুধু নয় বিরূপ আবহাওয়া যেমন- অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, R‡jv"Qwmও মাছ উৎপাদন ব্যাহত করছে। যেমন- ২০০৭ সালের সিডরে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪৭৮টি পুকুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, চাষি হারিয়েছে ৬ হাজার ৫১১ মেট্রিক টন মাছ যার বাজার মূল্য ছিল ৪৭৮ মিলিয়ন টাকা। জাল ও নৌকা হারিয়েছে ৭২১ মিলিয়ন টাকা g‡j¨i| cwZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ায় মাছ উৎপাদন ও রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে-

১. খরাপ্রবণ এলাকায় বড় পোনা ছাড়া যেতে পারে যেন অল্প সময়ে ফলন পাওয়া যায়। আবার যেসব মাছ স্বল্প সময়ে ফলন দেয় যেমন— তেলাপিয়া, খরাপ্রবণ এলাকায় চাষ করা যেতে পারে। চার-পাঁচ মাসেই এর ফলন পাওয়া যায়। এসব AÂ‡j দেশি মাগুরেরও চাষ করা যেতে পারে।

২. বন্যাপ্রবণ এলাকায় একই পুকুরে একটি দীর্ঘ ও একটি স্বল্পমেয়াদি মাছ চাষ পদ্ধতি নেওয়া যায়। এ mg¯— এলাকার পুকুরের পাড় উঁচু করে বাঁধতে হবে এবং যে সময় বন্যা থাকে না ঐ সময়ে পোনা মজুদ করা যায়।

৩. DcKjeZx AÂ‡j লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় লবণাক্ততা সহনশীল চাষযোগ্য মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষের ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন- ভেটকি, বাটা, পারশে। এসব জলাশয়ে চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের উদ্যোগ নেওয়া যায়। তেলাপিয়াও এক্ষেত্রে ভালো ফলন দেবে।

৪. cwZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ায় DcKjxq AÂ‡j বাঁধ ভেঙে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়েছে এমন এলাকায় পরিকল্পিত মাছ চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ ও কাঁকড়া চাষের মাধ্যমে ওই পানিকে কাজে লাগানো যায়।

৫. অতিবৃষ্টির কারণে পুকুর ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুকুরের পাড় বরাবর চারপাশে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে জাল দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। এতে মাছ বাইরে বের হয়ে যেতে পারে না।

৬. গ্রীষ্মের সময় পুকুরের পানির D"PZv কমে গেলে ও পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সেচ বা cv‡¤úi মাধ্যমে পুকুরে পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে মাছ পর্যাপ্ত পানি পাবে ও পরিবেশও ঠাণ্ডা থাকবে।

কাজ

খরা ও বন্যাপীড়িত এলাকায় কী উপায়ে মাছ চাষ ও করা যায় দলগতভাবে তা আলোচনা করবে ও শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শিখলাম : সমুদ্রপৃষ্ঠের D"PZv বৃদ্ধি, ভেটকি, বাটা, পারশে

পাঠ ৭ : বিরূপ আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল

এ অধ্যায়ের প্রথম পাঠে আমরা cwZKj পরিবেশ m¤ú‡K জেনেছি। cwZKj পরিবেশে জলবায়ু ও পরিবেশগত অন্যান্য উপাদান ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের AbK‡j থাকে না। এ অবস্থা m¤ú‡K মানুষের আগাম ধারণা থাকে। ফলে মানুষ ফসল নির্বাচন থেকে শুরু করে ফসলের ব্যবস্থাপনা m¤ú‡K আগে থেকেই সজাগ থাকে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু ফসল উৎপাদনকালীন যদি আবহাওয়ার অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ফসলের ক্ষতি হয় তখন তাকে আমরা বিরূপ আবহাওয়া বলি। বিরূপ আবহাওয়া একটি স্বল্পস্থায়ী অবস্থা। কিন্তু এ স্বল্পস্থায়ী অবস্থায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। এমনকি ফসল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অকাল জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, D"P তাপমাত্রা, নিম্ন তাপমাত্রা, NwYSo, R‡jv"Qwm, তুষারপাত ইত্যাদি বিরূপ আবহাওয়ার উদাহরণ। এখন আমাদের দেশের কিছু বিরূপ আবহাওয়া এবং সে আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার কৌশল নিয়ে আলোচনা করব।

১. জলাবদ্ধতা : অতিবৃষ্টি বা বন্যার কারণে কোনো স্থান জলাবদ্ধ হয়ে পড়াকে জলাবদ্ধতা বলে। পাহাড়ি ঢলের কারণে জলাবদ্ধতায় হাওর AÂ‡j বোরো ধান পাকার সময় তলিয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় জমি থেকে ধানের শীষ কেটে ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাঁধ ভেঙে জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে বাঁধ মেরামতের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। সুযোগ থাকলে নিষ্কাশন নালা কেটে জলাবদ্ধ জমি থেকে পানি বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আগাম বন্যায় কোনো এলাকার আমন রোপণ ব্যাহত হলে বন্যামুক্ত এলাকায় চারা উৎপাদন করে ঐ এলাকার পানি নেমে গেলে রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কৃষকরা যাতে দ্রুত অন্য ফসল চাষাবাদে যেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, চারা ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. অতিবৃষ্টি : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাসে বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এ সময়ে কখনো কখনো একটানা কয়েকদিন অতি বৃষ্টি হয়ে থাকে। এর ফলে মাঠ-ঘাট, ফসলের জমিতে পানি জমে যায়। অনেক ফসলের গাছ গোড়া নড়ে নেতিয়ে বা হেলে পড়ে। এ ধরনের আবহাওয়ায় ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারার গোড়ায় মাটি দিয়ে সোজা করে বাঁশের খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। এ সময় শাক-সবজির মাঠ বেশি ¶wZM¨— হয়। শাক-সবজির মাঠ থেকে দ্রুত পানি বের করে দিতে হবে। এ জন্য নিষ্কাশন নালা কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এ মৌসুমে শাক-সবজি চাষ করলে সাধারণত উঁচু বেড করে চাষ করা হয়। দুইটি বেডের মাঝে ৩০ সে.মি. সেচ/নিষ্কাশন নালা রাখা হয়।

৩. অনাবৃষ্টি : যদি শুষ্ক মৌসুমে একটানা ১৫ দিন বা এর বেশি দিন বৃষ্টি না হয় তখন আমরা তাকে অনাবৃষ্টি বলি। অনাবৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য আমরা সেচ দিয়ে থাকি। বৃষ্টিনির্ভর আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে যদি অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তবে জমিতে m¤úiK সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে নিড়ানি দিয়ে মাটির ফাটল বন্ধ করে রাখতে হবে। তাহলে ewRúxfe‡bi মাধ্যমে পানি কম বের হবে। রবি মৌসুমে সবজি ক্ষেতে জাবড়া প্রয়োগ করে পানি সংরক্ষণ করতে হবে। অনাবৃষ্টির কারণে মার্চ-এপ্রিল-মে মাসে পাট, ধান, শাকসবজির বীজ বপনের মতো জমিতে জো পাওয়া না গেলে বীজ বুনে সেচ দিতে হবে অথবা সেচ দিয়ে জো এলে বীজ বুনতে হবে।

৪. শিলাবৃষ্টি : বাংলাদেশে সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে শিলাবৃষ্টি হয়। অনেক সময় আগাম শিলাবৃষ্টির কারণে বিশেষ করে রবি ফসল, যেমন–পেঁয়াজ, রসুন, গম, আলু ইত্যাদি নষ্ট হয়। শিলার আকার ও পরিমাণের উপর ক্ষতি নির্ভর করে। ক্ষতি বেশি হলে এসব ফসল ক্ষেত থেকে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। আর যদি ক্ষতির পরিমাণ কম হয় এবং ফসল পরিপক্ব হতে বিলম্ব থাকে সেক্ষেত্রে ¶wZM¯— শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করে অবশিষ্ট ফসলের যত্ন নিতে হবে। অনেক সময় এপ্রিল-মে মাসে শিলাবৃষ্টির কারণে বোরো ধান, আম, ঢেঁড়শ, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি ফসল ক্ষতির শিকার হয়। বেগুন, মরিচ, ঢেঁড়শ ইত্যাদি ফসল বাড়ন্ত অবস্থায় শিলার আঘাতে ডালপালা ভেঙে নষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে ভাঙা ডালপালা ছাঁটাই করে সার ও সেচ দিয়ে যত্ন নিলে ফসলকে আবার আ‡Mi অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে cwZKj পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে পার্থক্য পোস্টার পেপারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

নতুন শিখলাম : বিরূপ আবহাওয়া

পাঠ ৮ : বিরূপ আবহাওয়ায় পশুপাখি রক্ষার কৌশল

যেকোনো দেশেরই তার আবহাওয়া ও fcKwZi নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চক্রাকারে চলতে থাকে। কিন্তু নিয়মের বাইরে হঠাৎ করে অকালবন্যা, ঝড়, R‡jv"Qvm, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, অতিঠান্ডা, fwgK¤ú ইত্যাদি মানুষ ও পশুপাখির অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। হঠাৎ করে দেখা দেওয়া পরিবেশের এরূপ আচরণকে বিরূপ আবহাওয়া বলা হয়। মনে রাখতে হবে cwZKj পরিবেশ স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি বছর আসে কিন্তু বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ করে চলে আসে। পশুপাখির ওপর বিরূপ আবহাওয়া প্রভাব নিম্নে দেওয়া হলো-

১। বিরূপ আবহাওয়ায় পশুর অভিযোজন হতে সময় লাগে।

২। পশুপাখির খাদ্যের অভাব দেখা দেয়।

৩। পশুপাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

৪। জীবিত পশুপাখির দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন কমে যায়।

৫। অনেক পশুপাখির মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

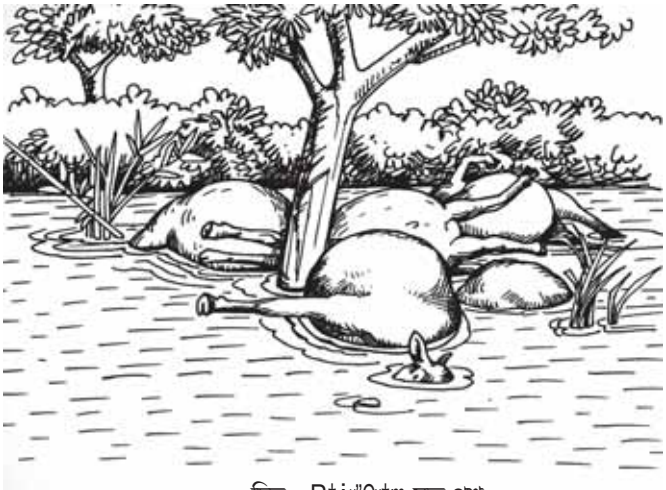

চিত্র : R‡jv"Qv‡m মৃত পশু

যেহেতু বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়, তাই এ সমস্যাকে মোকাবেলার জন্য কোনো cec¯‘wZ থাকে না, ফলে এর সমাধান কঠিন হয়ে পড়ে। বিরূপ আবহাওয়া হঠাৎ সৃষ্টি হলেও তা কখন হতে পারে এ m¤ú‡K বর্তমানে আবহাওয়াবিদগণ cevfvm দিয়ে থাকেন। তাই সে মোতাবেক `‡hvM ব্যবস্থাপনার জন্য c¯‘wZ থাকা আবশ্যক। বিরূপ আবহাওয়া মোকাবেলা একটি স্বল্পমেয়াদি কার্যক্রম। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়।

বিরূপ আবহাওয়ায় বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণ AÂ‡j NwYSo I R‡jv"Qv‡mi সময় মানুষ নিজেই অসহায় থাকে। তবুও এ সময় পশুপাখি রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ জলাবদ্ধতা ও বন্যার সৃষ্টি হলে অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে পশুপাখিকে আশ্রয় দিতে হবে। আ‡MB সংরক্ষণ করা খড়, গাছের পাতা, কচুরিপানা ও দানাদার খাদ্য পশুকে সরবরাহ করতে হবে। অতিবৃষ্টিতে পশুকে ঘরের বাইরে নেওয়া সম্ভব হয় না, তাই এ সময়ও পশুকে উলিখিত খাদ্য খেতে দিতে হয়। বিশেষ করে ছাগলের জন্য কাঁঠাল পাতা সংগ্রহ করে তার সামনে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

চিত্র : বিরূপ আবহাওয়ায় ছাগল পাতা Lv‡"Q

চিত্র : পশুর জন্য কচুরিপানা কাটা n‡"Q

শীতের সময় পশুকে অতি ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষার জন্য পশুর ঘরের চারপাশে বাতাস চলাচল বন্ধ করতে হবে। ঘরের মেঝেতে খড় বা নাড়া বিছিয়ে দিতে হবে। গরুর বাছুর যাতে নিউমোনিয়া আক্রান্ত না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

NwYSo ও R‡jv"Qv‡m মৃত পশুপাখিকে মাটির নিচে চাপা দিতে হবে। পশু ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক বেঁচে থাকা অসুস্থ পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. বরিশাল ছিল একসময় .....।

২. খরার কারণে বেশি করে ..... সার ব্যবহার করলে মাটির গঠন উন্নত হয়।

৩. জমিতে বেশি করে ..... সার ব্যবহার করলে মাটির গঠন উন্নত হয়।

৪. লবণাক্ত জমিতে প্রতিসেচ বা ..... পরপরই নিড়ানি দেওয়া প্রয়োজন।

বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

বামপাশ	ডানপাশ
১. বিরূপ আবহাওয়া	মসুর, খেসারি
২. খরাসহনশীল ফসল	গভীর পানির আমন ধান
৩. সমুদ্রের পানি	অতিবৃষ্টি
৪. হাওর এলাকা	অনাবৃষ্টি
	লবণাক্ততা

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী জলবায়ুগত উপাদান কোনটি?

ক. জলাবদ্ধতা খ. মাটির লবণাক্ততা

গ. বাতাসের বিষাক্ত গ্যাস ঘ. মাটিতে বিষাক্ত রাসায়নিক

২. মাটির উপরিভাগের m¶ ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিলে—

ক. রসসংরক্ষণ হবে খ. আগাছা নিয়ন্ত্রণ হবে

গ. জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে ঘ. উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে

৩. কচুরিপানা দিয়ে মাটি ঢেকে দিলে—

i. পানি সংরক্ষিত হবে

ii. পুষ্টি উপাদান কমে যাবে

iii. আগাছার উপদ্রব কম হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও**

আষাঢ় মাসে আগাম বন্যা দেখা দেওয়ায় নাসির উদ্দিন কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে আমন ধানের চারার জন্য ১ বর্গমিটার আয়তনের ৩টি ভাসমান বীজতলা তৈরি করে ধানের বীজ বপন করেন।

৪. নাসির উদ্দিন সাহেবের ৩টি বীজতলায় কত কেজি ধানের বীজ বপন করেছিলেন?

ক. ২.৫- ৩.০ কেজি খ. ৫.০- ৬.০ কেজি

গ. ৭.৫- ৯.০ কেজি ঘ. ১০.০- ১২.০ কেজি

৫. নাসির উদ্দিন এভাবে বীজতলা তৈরি করে চারা উৎপাদনের কারণে-

ক. সঠিক সময়ে ফলন পাবেন খ. ধানের আগাম ফলন পাবেন

গ. ধানের ফলন বেশি পাবেন ঘ. ধানের গুণগতমান ভালো হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২০০৭ সালের সিডরের সময় বেড়িবাঁধ ভেঙে গিয়ে মণীন্দ্র রায়ের জমিগুলো সমুদ্রের পানি দ্বারা পাবিত হয়। বেড়িবাঁধ মেরামতের পরেও জমিতে ভালো ফসল উৎপাদন করতে না পেরে কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ চাইলেন। কৃষি কর্মকর্তা মণীন্দ্র রায়কে তাঁর জমির সমস্যাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে কী ধরনের ফসল চাষ করতে হবে এবং কী ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করতে হবে সে পরামর্শ দিলেন। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ অনুসরণ করায় মণীন্দ্র রায় তাঁর জমির সমস্যা কাটিয়ে একজন সফল চাষিতে পরিণত হয়েছেন।

ক. বাংলাদেশের কোন AÂ‡j লবণাক্ততা সমস্যা বেশি?

খ. বৃষ্টি হলে লবণাক্ততা কমে যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. মণীন্দ্র রায় কী ধরনের মাঠে ফসল চাষ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মণীন্দ্র রায়ের সফলতার কারণ বিশেষণ কর।

২. কয়েক বছর যাবৎ কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় লালপুর গ্রামের কৃষকেরা ফসল উৎপাদনে মারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। এ অবস্থায় তারা কৃষিবিদ মিজান সাহেবের পরামর্শের জন্য গেলেন। মিজান সাহেব তাঁদেরকে বৃষ্টিহীন অবস্থায় ফসল চাষের বিভিন্ন কৌশল m¤ú‡K বলেন। সে অনুযায়ী কৃষকরা ফসলের wKQ bZb জাত ও আবর্জনা সংগ্রহ করেন। পরামর্শ অনুযায়ী ফসল উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে বর্তমানে তাঁরা বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

ক. দাপোগ বীজতলা কী?

খ. মাটিতে রসের ঘাটতি হলে কী সমস্যা হয়- ব্যাখ্যা কর।

গ. কৃষকদের আবর্জনা সংগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নতুন ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল উৎপাদন কৌশল বিশেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. অভিযোজন ক্ষমতা কাকে বলে?

২. মধ্যম উঁচু জমি কাকে বলে?

৩. জলাবদ্ধতা কাকে বলে?

৪. উত্তম লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল কী কী?

রচনামলক প্রশ্ন

১. ফসল উৎপাদনে c‖ZKj পরিবেশ আলোচনা কর।

২. মাটির ছিদ্র নষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় কীভাবে রস সংরক্ষণ করা যায় বর্ণনা কর।

৩. সেচ ও নিষ্কাশনের মাধ্যমে লবণাক্ততা `i‰KiY প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

৪. পশুপাখির ক্ষেত্রে বন্যার সময় করণীয় বিষয়গুলো আলোচনা কর।

cÂg Aa¨vq

কৃষিজ উৎপাদন

এ অধ্যায়ে ফসল উৎপাদনের মধ্যে গম চাষ, মাশরুম চাষ পদ্ধতি এবং কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও বাছাই m¤ú‡K আলোচনা করা হয়েছে। মাছ চাষের মধ্যে মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি (রুই, কাতলা, মৃগেল), চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু পালন পদ্ধতি ও রোগ ব্যবস্থাপনা m¤ú‡K ধারণা দেওয়া হয়েছে।

চিত্র : গম

চিত্র : চিংড়ি

চিত্র : মাশরুম

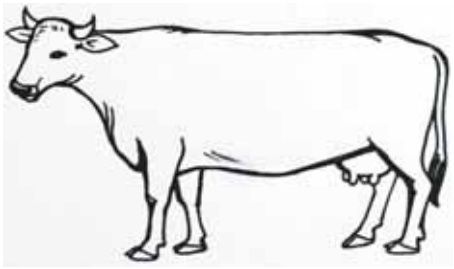

চিত্র : গরু

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা :

- শস্য চাষ (গম) পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মিশ্র মাছ চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চিংড়ি চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুপালন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- গৃহপালিত পশুর রোগ প্রতিরোধের উপায় ও রোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষণ করতে পারব।
- কৃষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ ও বাছাইকরণ কাজ বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : গম চাষ পদ্ধতি

দানা ফসল শর্করার প্রধান উৎস। এ কারণে পৃথিবীর সকল দেশে খাদ্যশস্য হিসাবে দানা ফসল চাষ করা হয়। বিশ্বের অনেক দেশে গম প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশে ধানের পরে খাদ্যশস্য হিসাবে গমের অবস্থান দ্বিতীয়। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলাতেই গমের চাষ করা হয়। তবে দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, জামালপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলায় বেশি চাষ হয়। বাংলাদেশে গমের অনেক D"Pdjbkxj অনুমোদিত জাত রয়েছে। তন্মধ্যে KvÂb, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব, শতাব্দী, প্রদীপ, বিজয় ইত্যাদি জাত জনপ্রিয়।

বপন সময় : গম শীতকালীন ফসল। বাংলাদেশে শীতকাল স্বল্পস্থায়ী। এ কারণে গমের ভালো ফলন পেতে হলে সঠিক সময়ে গম বীজ বপন করা উচিত। আমাদের দেশে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গম বপনের উপযুক্ত সময়। উঁচু ও মাঝারি দোআঁশ মাটিতে গম ভালো জন্মে। তবে লোনা মাটিতে গমের ফলন কম হয়। যেসব এলাকায় ধান কাটতে ও জমি তৈরি করতে দেরি হয় সেসব এলাকায় কাঞ্চন, আকবর, প্রতিভা, গৌরব চাষ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার : বীজ গজানোর হার শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি হলে ভালো। এক হেক্টর জমিতে ১২০ কেজি গম বীজ বপন করতে হয়। বপনের আগে বীজ শোধন করে নিলে বীজবাহিত অনেক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম প্রভেক্স ২০০-এর সাথে ভালো করে মিশিয়ে বীজ শোধন করা যায়।

বপন পদ্ধতি : জমিতে জো এলে ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দেওয়ার পর জো এলে চাষ দিতে হবে। সারিতে বা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। ছিটিয়ে বপন করলে শেষ চাষের সময় সার ও বীজ ছিটিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে জমি তৈরির পর ছোট হাত লাঙল দিয়ে ২০ সে.মি. `‡i `‡i mi নালা তৈরি করতে হয়। ৪-৫ সে.মি. গভীর নালায় বীজ বপন মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। বপনের ১৫ দিন পর পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে মোট ইউরিয়া সারের তিন ভাগের দুই ভাগ এবং সবটুকু টিএসপি, এমপি ও জিপসাম সার শেষ চাষের সময় দিতে হবে। বাকি এক ভাগ ইউরিয়া সার প্রথম সেচের সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে পুরো ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি এবং জিপসাম সার শেষ চাষের সময় জমিতে দিতে হবে। গম চাষে সার প্রয়োগের পরিমাণ নিচের তালিকায় দেওয়া হলো :

সারের নাম সারের পরিমাণ/হেক্টর		
	সেচসহ	**সেচ ছাড়া**
ইউরিয়া	২০০ কেজি	১৬০ কেজি
টিএসপি	১৬০ কেজি	১৬০ কেজি
এমপি	৪৫ কেজি	৩৫ কেজি
জিপসাম	১১৫ কেজি	৮০ কেজি
†Mvei/K‡¤úv÷ সার	৮.৫ টন	৮.৫ টন

পানি সেচ : মাটির বুনটের প্রকার অনুযায়ী গম চাষে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময়, দ্বিতীয় সেচ গমের শিষ বের হওয়ার সময় এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় দিতে হবে।

আগাছা দমন : সার, সেচের পানি ইত্যাদিতে আগাছা ভাগ বসায়। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের আগে নিড়ানি দিতে হবে। উপরি প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। গম ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখার জন্য কমপক্ষে দুইবার নিড়ানি দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : গম পাকলে গাছ হলদে হয়ে মরে যায়। তালুতে শিষ নিয়ে ঘষলে দানা বের হয়ে আসবে। এ অবস্থায় গম কেটে ভালোভাবে শুকিয়ে মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মাড়াই করতে হবে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে গমের উৎপাদন বৈশিষ্ট্য m¤ú‡K খাতায় লেখ এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ২ : গম চাষে অন্যান্য প্রযুক্তি ও পরিচর্যা

বিনা চাষে গমের আবাদ :

অনেক জমিতে রোপা আমন ধান কাটতে দেরি হয়। ফলে জমি চাষ-মই দিয়ে বীজ বোনার সময় থাকে না। এক্ষেত্রে বিনা চাষে গম আবাদ করা যায়। ধান কাটার পর যদি জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকে অর্থাৎ হাঁটলে পায়ের দাগ পড়ে তবে সরাসরি বীজ বুনতে হয়। আবার জমিতে 'জো' না থাকলে হালকা সেচ দিয়ে 'জো' এলে বীজ বুনতে হয়। প্রথমে গম বীজ গোবর গোলানো পানিতে কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। পরে পানি থেকে উঠিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এতে বীজের গায়ে গোবরের প্রলেপ লেগে যায়। এ বীজ বপন করলে পাখির উপদ্রব কম হয় এবং বীজ রোদে শুকিয়ে যায় না। এভাবে গম চাষ করলে দু'ভাবে সার দেওয়া যায়– ১) বীজ বোনার সময় সব সার ছিটানো, ২) বীজ বপনের ১৭-২০ দিনের মধ্যে প্রথম হালকা সেচ দেওয়ার সময় সব সার ছিটানো। বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করা প্রয়োজন হয়।

স্বল্প চাষে গমের আবাদ :

দেশি লাঙল দিয়ে ২টি চাষ দিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসার সাথে সাথে চাষ করতে হবে। আবার জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সেচ দেয়ার পর 'জো' আসলে চাষ দিতে হবে। প্রথমে একটি চাষ ও মই দিতে হবে। দ্বিতীয় চাষ দেওয়ার পর সব সার ও বীজ ছিটিয়ে দিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। বপনের ১৭-২১ দিনের মধ্যে হালকাভাবে প্রথম সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচের সময় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে।

গম চাষে রোগ-পোকা দমন :

গম চাষে পোকা মাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা হয় না। তবে ছত্রাকজনিত বেশ কিছু রোগ দেখা দিতে পারে। এছাড়া অনেক সময় ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। ছত্রাকজনিত রোগের মধ্যে পাতার মরিচা রোগ, পাতার দাগ রোগ, গোড়া পচা রোগ, আলগা ঝুল রোগ এবং বীজের কালো দাগ রোগ অন্যতম।

পাতার মরিচা রোগে প্রথমে পাতার ওপর ছোট গোলাকার হলুদাভ দাগ পড়ে। শেষ পর্যায়ে এ রোগে মরিচার মতো বাদামি বা কালচে রঙে পরিণত হয়। হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা ঘষা দিলে লালচে মরিচার মতো গুড়া হাতে লাগে। এ রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায়, পরে সব পাতায় ও কাণ্ডে দেখা যায়। পাতার দাগ রোগে প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরে দাগ আকারে বেড়ে পাতা ঝলসে যায়। এ রোগের জীবাণু বীজে বা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। গোড়া পচা রোগে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে দাগ গাড় বাদামি বর্ণ ধারণ করে আক্রান্ত স্থানের চারপাশ ঘিরে ফেলে। পরে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

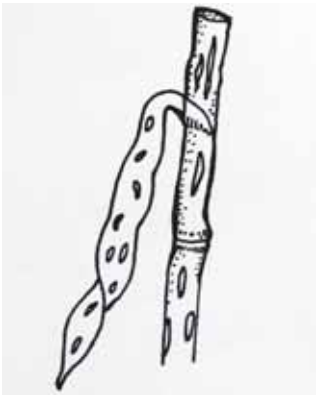

চিত্র : পাতার মরিচা রোগ

গমের শিষ বের হওয়ার সময় আলগা ঝুল রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আক্রান্ত গমের শিষ প্রথম দিকে পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। পরে তা ফেটে যায় এবং দেখতে কালো ঝুলের মতো দেখায়। বীজের কালো দাগ রোগের ফলে গমের খোসায় বিভিন্ন আকারের বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। বীজের ভ্রূণে দাগ পড়ে এবং A\‡¯— A\‡¯— দাগ পুরো বীজে ছড়িয়ে পড়ে।

চিত্র : আলগা ঝুল রোগ

গমের এসব ছত্রাকজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধী জাতের গম যেমন– K\Âb, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব চাষ করতে হবে। রোগমুক্ত জমি থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। গম বীজ বপনের আগে শোধন করে নিতে হবে। সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

ইঁদুর গমের একটি প্রধান শত্রু। গমের শিষ আসার পর ইঁদুরের উপদ্রব শুরু হয়। গম পাকার সময় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। ইঁদুর দমনের জন্য হাতে তৈরি বিষ টোপ বা বাজার থেকে কেনা বিষ টোপ ব্যবহার করা যায়। এসব বিষ টোপ সদ্য মাটি তোলা ইঁদুরের গর্তে বা চলাচলের i\স্তা\q পেতে রাখতে হয়। বিষ টোপ ছাড়া বাঁশ বা কাঠের তৈরি ফাঁদের সাহায্যেও ইঁদুর দমন করা যায়।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। এক দল বিনা চাষে গমের আবাদ এবং অপর দল স্বল্প চাষে গমের আবাদ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : বিনা চাষে গমের আবাদ, স্বল্প চাষে গমের আবাদ, পাতার মরিচা রোগ, আলগা ঝুল রোগ

পাঠ ৩ : মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা

আমরা জানি ছত্রাক ফসলের অনেক রোগের জন্য দায়ী। কিন্তু সব ছত্রাক রোগ সৃষ্টি করে না। অনেক ছত্রাক রয়েছে যারা আমাদের জন্য উপকারী। মাশরুম এমন এক ধরনের ছত্রাক যা m¤úY খাওয়ার উপযোগী, পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ঔষধিগুণ m¤úb| আসলে মাশরুম এক ধরনের মৃতজীবী ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ যা ভক্ষণযোগ্য। অনেকে ভুল করে

চিত্র : মাশরুম (ওয়েস্টার)

মাশরুম ও ব্যাঙের ছাতাকে এক জিনিস মনে করে। ব্যাঙের ছাতা প্রাকৃতিকভাবে যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা বিষাক্ত ছত্রাকের ফলন্ত অঙ্গ। আর মাশরুম টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপন্ন বীজ দ্বারা c‖i"Qb পরিবেশে চাষ করা সবজি। মাশরুম নিজে সুস্বাদু খাবার এবং অন্য খাবারের সাথে ব্যবহার করলে তার স্বাদও বাড়িয়ে দেয়। মাশরুমের স্বাদ মাংসের মতো। মাশরুম দিয়ে চায়নিজ ও পাঁচতারা হোটেলে নানা রকম মুখরোচক খাবার তৈরি করা হয়। তবে দেশীয় পদ্ধতিতে মাশরুম সবজি, ফ্রাই, স্যুপ, পোলাও, বিরিয়ানি, নুডুলস, চিংড়ি, ছোট মাছের সাথে ব্যবহার করা যায়। মাশরুম তাজা, শুকনা বা গুঁড়া হিসাবে খাওয়া যায়।

পুষ্টিমান বিচারে মাশরুম সবার সেরা ফসল। কারণ মাশরুমে অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান, যেমন– প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস অতি উঁচু মাত্রায় আছে। প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মাশরুমে ২৫-৩৫ গ্রাম আমিষ, ১০-১৫ গ্রাম সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলস, ৪০-৫০ গ্রাম শর্করা ও আঁশ এবং ৪-৬ গ্রাম চর্বি আছে। মাশরুমের আমিষ অত্যন্ত উন্নত মানের। এ আমিষে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় ৯টি এমাইনো এসিডই আছে। এ আমিষ গ্রহণে D"P রক্তচাপ, হৃদরোগ ও মেদভুঁড়ি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ আমিষের সাথে ক্ষতিকর চর্বি থাকে না। পক্ষান্তরে মাশরুমের চর্বি হাড় ও দাঁত তৈরিতে এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে। মাশরুমের শর্করায় অনেক ধরনের রাসায়নিক উপাদান থাকে যা অনেক জটিল রোগ নিরাময়ে কাজ করে।

ভিটামিন ও মিনারেল দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। আমাদের দেহের জন্য দৈনিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ও মিনারেলের চাহিদা রয়েছে। আমরা প্রতিদিন মাশরুম খাওয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলের চাহিদা মেটাতে পারি। মাশরুমে থায়ামিন (বি ১), রিবোফ্লাবিন (বি ২), নায়াসিন ইত্যাদি ভিটামিন এবং ফসফরাস, লৌহ, ক্যালসিয়াম, কপার ইত্যাদি মিনারেল প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। পুষ্টিগুণের কারণে মাশরুম অনেক রোগের প্রতিরোধক ও নিরাময়কারী হিসাবে কাজ করে, যেমন– ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, D"P রক্তচাপ, রক্তkb¨Z‖, আমাশয়, চুল পড়া, ক্যান্সার, টিউমার ইত্যাদি।

একজন সুস্থ লোকের প্রতিদিন ২০০-২৫০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রতিদিন গড়ে ৪০-৫০ গ্রাম (আলু বাদে) সবজি খাই। যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ফলে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে বিভিন্ন রোগে ভুগে থাকি। বাংলাদেশে দ্রুত চাষযোগ্য জমি কমে h‖‡"Q| অধিকাংশ জমি ধান চাষে ব্যবহৃত হয়। সবজি চাষের আওতায় জমির পরিমাণ বাড়ানো কঠিন। এমতাবস্থায় মাশরুম হতে পারে আদর্শ ফসল। মাশরুম এমন একটি ফসল যা চাষ করার জন্য কোনো উর্বর জমির প্রয়োজন নেই। ঘরের মধ্যে তাকে তাকে চাষ করা যায় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে অর্থাৎ ৭-১০ দিনের মধ্যে ফলানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু মাশরুম চাষের অত্যন্ত উপযোগী। মাশরুম চাষের উপকরণ, যেমন–খড়, কাঠের গুড়া, আখের ছোবড়া, পচা পাতা ইত্যাদি m¯—‖ ও সহজলভ্য।

মাশরুম চাষ ব্যবসায়িক দিক থেকে খুবই লাভজনক। কারণ মাশরুম চাষে কম পুঁজি, কম শ্রম দরকার হয়। অল্প দিনের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থ তুলে আনা যায়। অন্যদিকে একক জায়গায় অধিক ফলন, লাভ ও বাজারgj¨ পাওয়া যায়। তাই মাশরুম চাষ করে বেকার যুবসমাজ সহজেই আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। ঘরে

ঘরে মাশরুম চাষ করে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা যেমন মেটানো যাবে তেমনি বাজারে বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা ও একজন মাশরুম চাষির সফলতার কাহিনী পোস্টার বা ভিডিও এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দেখাবে। সে অনুসারে শিক্ষার্থীরা একক কাজ হিসাবে মাশরুমের পুষ্টিমান m¤ú‡K এবং দলীয় কাজ হিসেবে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা খাতায় লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪ : মাশরুম চাষ পদ্ধতি

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায় মিল্কি, ঋষি ও স্ট্র মাশরুম এবং শীতকালে শীতাকে, বাটন, শিমাজি ও ইনোকি মাশরুম। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয় বারোমাসি ওয়েস্টার মাশরুম। বিভিন্ন ধরনের মাশরুম চাষে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। আমরা এ পাঠে ওয়েস্টার মাশরুম চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K জানব।

চিত্র : ওয়েস্টার মাশরুম

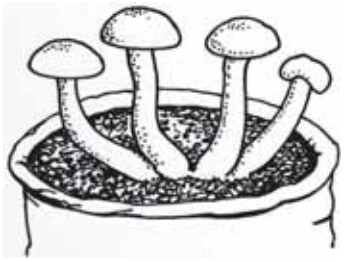

চিত্র : মিল্কি হোয়াইট মাশরুম

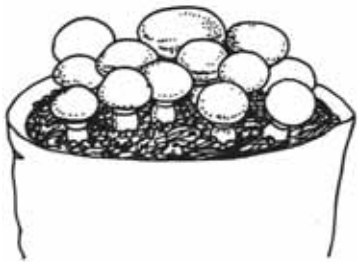

চিত্র : বাটন মাশরুম

মাশরুমের বীজ বা ¯úb তৈরি : মাশরুমের বীজ ল্যাবরেটরিতে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদন করা হয়। চাষি পর্যায়ে মাশরুম চাষের জন্য প্যাকেটজাত বীজ কিনতে পাওয়া যায় যাকে বাণিজ্যিক ¯úb বলে। আবার খড় দিয়ে চাষিরা নিজেরাও ¯úb তৈরি করে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে চাষিদেরকে বাজার থেকে মাদার ¯úb সংগ্রহ করে ¯úb তৈরি করে নিতে হয়।

চিত্র : বাণিজ্যিক ¯úb

চাষঘর তৈরি : মাশরুম চাষের ঘরটিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন প্রবেশের জন্য জানালা রাখতে হবে। ঘরটিতে আবছা আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঘরের তাপমাত্রা ২০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। মাশরুম আর্দ্র অবস্থা পছন্দ করে। ঘরটিতে ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতার ব্যবস্থা করতে হবে। মাশরুম চাষ ঘরে অসংখ্য অনুজীবের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে প্রচুর কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাই অক্সাইড ভারী বলে নিচের দিকে জমা হয়। এজন্য বেড়ার নিচে খোলা রাখতে হয়।

¯úb **সংগ্রহ :** চাষঘর তৈরির পর ॥ek¯— প্রতিষ্ঠান থেকে পলি প্যাকেটে তৈরি ¯úb সংগ্রহ করতে হবে। ভালো ¯ú‡bi বৈশিষ্ট্য হলো প্যাকেটটি সুষমভাবে মাইসিলিয়াম দ্বারা cY ও সাদা হবে। ¯úb সংগ্রহের পর তাড়াতাড়ি প্যাকেট কাটার ব্যবস্থা করতে হবে। কাটতে দেরি হলে e¯—॥ থেকে প্যাকেট বের করে আলাদা আলাদা জায়গায় ঘরের ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হবে।

প্যাকেট কর্তন : চাষঘরে বসানোর আগে ¯úb প্যাকেট সঠিক নিয়মে কেটে চেঁছে পানিতে চুবিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ¯úb প্যাকেটের কোনাযুক্ত দুই কাঁধ বরাবর প্রতি কাঁধে ২ B॥Â লম্বা এবং ১ B॥Â ব্যাস করে কাটতে হবে। উভয় পার্শ্বের এ কাটা জায়গার সাদা অংশ বেড দিয়ে চেঁছে ফেলতে হবে। এবার প্যাকেটটি ৫-১৫ মিনিট পানিতে উপুড় করে চুবিয়ে নিতে হবে। চুবানোর পর পানি ভালোভাবে ঝরিয়ে সরাসরি চাষঘরের মেঝেতে অথবা তাকে সারি করে সাজিয়ে চাষ করতে হবে।

পরিচর্যা : চাষঘরের মেঝে বা তাকে দুই B॥Â পর পর ¯úb সাজাতে হবে। ¯úb প্যাকেটের চারপাশের আর্দ্রতা ৭০-৮০% রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী গরমে ৪-৫ বার, শীতে বা বর্ষায় ২-৩ বার পানি স্প্রে করতে হবে। স্প্রেয়ারের নজল প্যাকেটের এক ফুট ওপরে রেখে স্প্রে করতে হবে। আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ¯úb প্যাকেটের ওপর কখনো খবরের কাগজ ভিজিয়ে, কখনো e¯—॥ ভিজিয়ে একটু উঁচু করে রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা : পরিচর্যা ঠিকমতো হলে ২-৩ দিনের মধ্যে মাশরুমের অঙ্কুর পিনের মতো বের হবে। প্রতি পার্শ্বে ৮-১২টি বড় অঙ্কুর রেখে ছোটগুলো কেটে ফেলতে হবে। ৫-৭ দিনের মধ্যে মাশরুম তোলার উপযোগী হবে। প্রথমবার মাশরুম তোলার পর একদিন বিশ্রাম অবস্থায় রাখতে হবে। পরের দিন আগেi কাটা অংশে পুনরায় বেড দিয়ে চেঁছে ফেলে পানি স্প্রে করতে হবে। একটি প্যাকেট থেকে ৮-১০ বার মাশরুম সংগ্রহ করা যায়। এতে একটি প্যাকেট থেকে ২০০-২৫০ গ্রাম মাশরুম পাওয়া যাবে।

মাশরুম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : মাশরুম যথেষ্ট বড় হয়েছে কিন্তু শিরাগুলো ঢিলা হয়নি— এমন অবস্থায় হাত দিয়ে আলতো করে টেনে তুলতে হবে। পরে গোড়া কেটে বাছাই করে পলি ব্যাগে ভরে মুখ বন্ধ করে বাজারজাত করতে হবে। এগুলো ঠাণ্ডা জায়গায় ২-৩ দিন রেখে খাওয়া যায়। ফ্রিজে রাখলে ৭-৮ দিন ভালো থাকে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। ওয়েস্টার মাশরুম চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : মৃতজীবী ছত্রাক, ফলন্ত অঙ্গ, চাষঘর, ¯úb

পাঠ ৫ : উদ্যান ফসল সংগ্রহ ও বাছাই

ফল, শাক-সবজি ও ফুল দ্রুত পচনশীল। এসব পণ্য দেশীয় প্রচলিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ, বাছাই ও বাজারজাত করায় ক্ষেত্র বিশেষে শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। আর্থিক ও পুষ্টির বিবেচনায় এ ক্ষতি অপরিসীম। কিন্তু তোলা থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত একটু সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পণ্যের বাহ্যিক তরতাজা চেহারা, নিজ নিজ স্বাদ, গন্ধ, রং ও গুণগতমান পুরোপুরি বজায় থাকে। ফলে পণ্য নষ্ট কম হয় এবং ভালো বাজারgj¨ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন উদ্যান ফসলের ফল, পাতা, কুঁড়ি, অঙ্কুর, gj, কান্ড, কলি ও ফুল ইত্যাদি অংশ আমরা ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করি। ফসল সংগ্রহের জন্য আমাদের বাণিজ্যিক পরিপক্বতাকে বিবেচনা করতে হয়। বাণিজ্যিক পরিপক্বতা বলতে ফসলের ব্যবহার্য অংশের এমন অবস্থানকে বোঝায় যখন মানুষ তা খাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারে। যেমন– শসা, লাউ, কুমড়া, বেগুন, শীম, বরবটি, ঢেঁড়শ, পাতাজাতীয় সবজি ইত্যাদি আমরা বাড়ন্ত অবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রহ ও বাজারজাত করি। ফলকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের ফল গাছ থেকে তোলার পর ফলের মধ্যে শর্করা থেকে চিনিতে রূপান্তর বন্ধ হয়ে যায়। যেমন– জাম্বুরা, লেবু, আঙ্গুর, লিচু ইত্যাদি। এসব ফল পাকার পরই তোলা উচিত। আবার আম, কাঁঠাল, পেঁপে, কলা, বেল ইত্যাদি ফল গাছ থেকে তোলার পরও শর্করা থেকে চিনিতে রূপান্তর হতে থাকে, সুগন্ধ ছড়ায় ও রং ধারণ করে। এসব ফল পাকার আগে গাছ থেকে পাড়া হয়।

ভালো বাজারgj¨ পাওয়ার জন্য উদ্যান ফসল যথাযথভাবে সংগ্রহ, cwi®‹vi-cwi”Qb, ছাঁটাই, বাছাই, প্যাকিং ও পরিবহন করা প্রয়োজন। সঠিকভাবে এ কাজ না করলে পণ্য থেকে ewóºfeb, প্রস্বেদন ও শ্বসনের মাধ্যমে পানি বের হয়ে কুঁচকে যেতে পারে, তাপমাত্রা বাড়ার ফলে শ্বসন বেড়ে গিয়ে কোষ-কলা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং রোগ-জীবাণুর আক্রমণে পণ্য পচে যেতে পারে। এসব ক্ষতি থেকে পণ্যকে রক্ষার জন্য আমাদের নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে।

১. ফসল তোলার mPK/wb‡`kK **:** ফসল তোলার জন্য আমাদের বাণিজ্যিক পরিপক্বতাকে বিবেচনা করে সঠিক সময়ে ফসল তুলতে হবে।

২. ফসল তোলার পদ্ধতি : উদ্যান ফসল সাধারণত দু'ভাবে তোলা হয়, যথা– ক) হাত দিয়ে এবং খ) যন্ত্রের সাহায্যে। ফসল সংগ্রহের সময় নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে–

ক) সাবধানে তোলা যাতে গাছের বা তোলা ফসলের কোনোটার ক্ষতি না হয়।

খ) তোলার সময় হাতের নখ, ছুরি বা যন্ত্রের আঘাতে ফসলের গাঁয়ে ক্ষত সৃষ্টি করা, গাছ মোচড়ানো, মাটিতে ফেলে দেওয়া, গাঁয়ে মাটি লাগানো, m‡hi তাপ লাগানো ইত্যাদি বিষয় পরিহার করা।

৩. ফসল রাখার পাত্র : ক্ষেত থেকে ফসল তুলে পরিষ্কার-cwi”Qb পাত্রে রাখতে হবে। পাত্র এমন হতে হবে যেন পণ্যের কোনো ক্ষতি না হয়। আমরা ফসল রাখার জন্য পাটের e¯—v, প্লাস্টিকের ঝুড়ি, বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি।

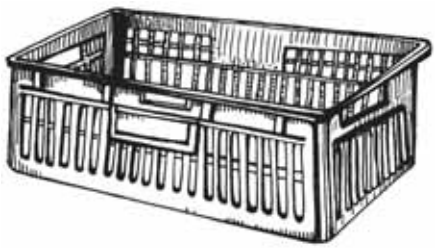

চিত্র : প্লাস্টিক ঝুড়ি

৪. মাঠ থেকে পরিবহন : মাঠ থেকে বাছাই করার স্থানে পণ্য নেওয়ার সময় সতর্ক থাকতে হবে। পণ্যভর্তি পাত্র আছড়ে ফেলা যাবে না। গাদাগাদি করে বোঝাই করা যাবে না। ধীরগতিতে গাড়ি চালাতে হবে যাতে ঝাঁকুনি কম লাগে।

৫. তাপমাত্রা : ক্ষেত থেকে তোলার পর পণ্যকে m‡hi তাপ থেকে রক্ষা করতে হবে। তাপে পণ্যের উত্তাপ বেড়ে যায়। ফলে গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। পণ্য সকালে বা বিকালে তুলতে হবে। তোলার পর যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

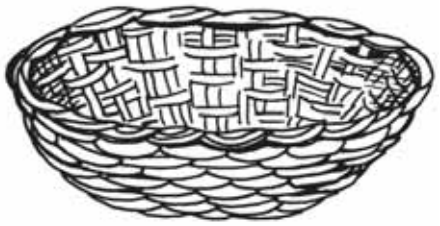

চিত্র : বাঁশের ঝুড়ি

৬. পণ্য বাছাই : পণ্য মাঠ থেকে আনার পর প্রথমে অপ্রয়োজনীয় বা অগ্রহণযোগ্য পণ্য বেছে আলাদা করতে হবে। পরে পণ্যের আকার, আকৃতি অনুযায়ী কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর বাজারজাত করার জন্য পণ্য প্যাকিং করতে হবে। আমরা e¯—v, পলিথিনের শিট, পাস্টিকের ঝুড়ি, বাঁশ বা বেতের ঝুড়ি অথবা কাগজের বা কাঠের বাক্সে প্যাকিং করে থাকি। প্যাক করা পণ্য গন্তব্যস্থানে পাঠানোর cegnZ পর্যন্ত রাখতে হলে অবশ্যই ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হবে।

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। উদ্যান ফসল সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত কোন ধাপে কী করা হয় তা আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

নতুন শিখলাম : বাণিজ্যিক পরিপক্বতা, পণ্য বাছাই

পাঠ ৬ : মাঠ ফসল সংগ্রহ ও বাছাই

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা মাঠ ফসল m¤ú‡K জেনেছি। ফসল পাকার পর কাটা থেকে শুরু করে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত অনেক ধাপ পার হয়ে আসতে হয়। এসব ধাপে সঠিক পরিচর্যার অভাবে উৎপাদিত ফসলের মান খারাপ হয়ে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে চাষিরা ন্যায্য gj¨ পান না। ফসল কাটা থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ধাপগুলোতে একটু সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ ক্ষতি সহজেই কমিয়ে আনা যায়।

১. সঠিক সময়ে ফসল কাটা : খাদ্যশস্য ফসলের আমরা বীজ ব্যবহার করে থাকি। বীজ ভালোভাবে পরিপক্ব হওয়ার পরই ফসল সংগ্রহ করতে হবে। অর্থাৎ ফসল পাকার পর কাটতে হবে। তবে ফসল কাটার সময় আবহাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ ঝড়-বৃষ্টির সময় ফসল সংগ্রহ করা যায় না। আবার সংগ্রহ করলেও মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকানো যায় না। ফসল জমা করে রাখায় তাপ বেড়ে পচে যেতে পারে, গন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার ঝড়-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুরোপুরি পাকার আগেই অনেক সময় সংগ্রহ করতে হয়।

ফসল কাটার ১৫-২০ দিন আগে পানি সেচ বন্ধ করে দিতে হবে। এতে করে ফসলের দৈহিক বৃদ্ধি কম হবে এবং পরিপক্বতা তরান্বিত হবে। ধান কাটার জন্য ফসল সোনালি বর্ণ ধারণ করলে অথবা ৮০% ধান পরিপক্ব হলে ফসল কাটা যাবে। ডাল ও তেল ফসলের ক্ষেত্রে গাছ মরে হলদেভাব হবে। দানা পুষ্ট হলে ফসল কাটা যাবে। তবে বেশি শুকিয়ে গেলে ফলে কাটা ও পরিবহনের সময় দানা ঝরে পড়বে। ধান, গম ফসল কাঁচি দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে কাটা যায়।

২. মাড়াইকরণ : মাড়াই করার জন্য কাটা ফসল ভালোভাবে শুকিয়ে নিলে দ্রুত মাড়াই করা যায়। মাড়াইয়ের সময় দানা নষ্ট হয় না। ধান-গম মাড়াই করার জন্য পা বা শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আবার অনেক সময় ড্রাম বা মাচার ওপর হাত দিয়ে পিটিয়েও দানা আলাদা করা যায়। মাড়াই করার আগে মাড়াইয়ের স্থান ভালোভাবে পরিষ্কার-cwi"Qb করে নিতে হবে। ডাল ও তেল ফসল মাড়াই করার আগে খুব ভালো শুকিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। ফসলের পরিমাণ বেশি হলে গরু দিয়ে ফসল মাড়াই করা হয়। অন্যথায় লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ফসল মাড়াই করা হয়।

৩. ঝাড়াই : ফসল মাড়াই করার পর ফসলের পরিত্যক্ত অংশ দানা থেকে আলাদা করে প্রথমে হালকাভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। অতঃপর কুলা, বাতাস বা শক্তিচালিত ফ্যানের সাহায্যে দানা ঝাড়াই করা হয়। ঝাড়াই করার ফলে দানা থেকে খড়-কুটা, চিটা ও অন্যান্য আবর্জনা বাছাই হয়ে যায়।

৪. ফসল শুকানো : মাড়াই-ঝাড়াই করার পর দানা ভালোভাবে শুকাতে হবে। দানা শুকানোর মাধ্যমে দানার মধ্যে আর্দ্রতাকে একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে আনতে হবে। দানাকে ২-৩টি রোদে এমনভাবে শুকাতে হবে যেন দাঁত দিয়ে চাপ দিলে 'কট' করে শব্দ হয়। এ অবস্থায় দানায় আর্দ্রতার মাত্রা ১০-১২% এ চলে আসে। গুদামজাত অবস্থায় দানায় আর্দ্রতার মাত্রা বেশি থাকলে বিভিন্ন রোগ ও পোকার আক্রমণে দানা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, পচে যেতে পারে বা মান খারাপ হয়ে যেতে পারে।

৫. পরিবহন : শুকানোর পর দানা গরম অবস্থায় e¯—vবন্দি করা ঠিক না। একটু ঠাণ্ডা হওয়ার পর পাস্টিক বা চটের e¯—vq ভর্তি করে গুদাম বা গোলা ঘরে নিয়ে যেতে হয়। ছেঁড়া-ফাটা e¯—v পরিহার করতে হবে। ফসল বেশি হলে গাড়িতে পরিবহন করতে হয়। গাড়িতে ওঠানো-নামানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন e¯—v ছিড়ে দানা নষ্ট না হয়।

৬. গুদামজাতকরণ : যে ঘর বা কক্ষে সংগৃহীত ফসল রাখা হয় তাকে গুদাম ঘর বলে। গুদাম ঘরের মেঝের একটু ওপরে বাঁশ বা কাঠের পাটাতন করে তার ওপর ফসল রাখা হয়। আমাদের দেশে চট বা পাস্টিকের e¯—v, বাঁশের চাটায় দিয়ে তৈরি ডোল, মাটির মটকা, পাস্টিক বা টিনের ড্রামের ভেতর দানাশস্য সংরক্ষণ করা হয়। গুদাম ঘর পরিষ্কার-cwi"Qb রাখতে হবে। এতে করে পোকা-মাকড় ও ইঁদুরের আক্রমণ কম হয়। দানা রাখার সময় ভাঁজে ভাঁজে শুকানো নিমপাতা দিলে পোকার আক্রমণ হয় না। গুদাম ঘর মাঝে মাঝে পরিদর্শন করতে হবে। দানার আর্দ্রতা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে আবার রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

চিত্র : ডোল

চিত্র : চটের বস্তায় সংরক্ষণ

শ্রেণির কাজ : শিক্ষার্থীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। মাঠ ফসল সংগ্রহ থেকে শুরু করে গুদামজাত করা পর্যন্ত কোন ধাপে কী করা হয় তা আলোচনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ ৭ : মাছের মিশ্র চাষের সুবিধা ও উপযোগী পুকুর

যেসব প্রজাতির মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের নয়, খাদ্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে না, জলাশয়ের বিভিন্ন ¯—‡i বাস করে এবং বিভিন্ন ¯—‡ii খাবার গ্রহণ করে— এসব গুণের কয়েক প্রজাতির মাছ একই পুকুরে একত্রে চাষ করাকেই মিশ্র চাষ বলে। মিশ্র চাষ করার জন্য কার্প বা রুই জাতীয় মাছ বেশি উপযোগী, যেমন সিলভার কার্প, রুই, কাতলা, কার্পিও ইত্যাদি। আমাদের দেশি কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতলা ও মৃগেল অন্যতম। এরা পুকুরে মিশ্র চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এ মাছগুলো পুকুরে চাষের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১। এরা জলাশয়ের বিভিন্ন ¯—‡ii খাবার খায় যেমন— কাতলা পুকুরের ওপরের ¯—‡i, রুই মধ্য ¯—‡i ও মৃগেল নিচের ¯—‡ii খাবার খায়।

২। এরা রাক্ষুসে স্বভাবের নয়।

৩। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো।

৪। দ্রুত বর্ধনশীল।

৫। চাষের জন্য সহজেই হ্যাচারিতে পোনা পাওয়া যায়।

৬। স্বল্প মূল্যের m¤ciK খাবার খেয়ে বেড়ে ওঠে।

৭। খেতে সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা আছে।

কাজ

মিশ্র চাষের সুবিধা বিষয়ের ওপর একটি দলগত কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং পোস্টার পেপারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

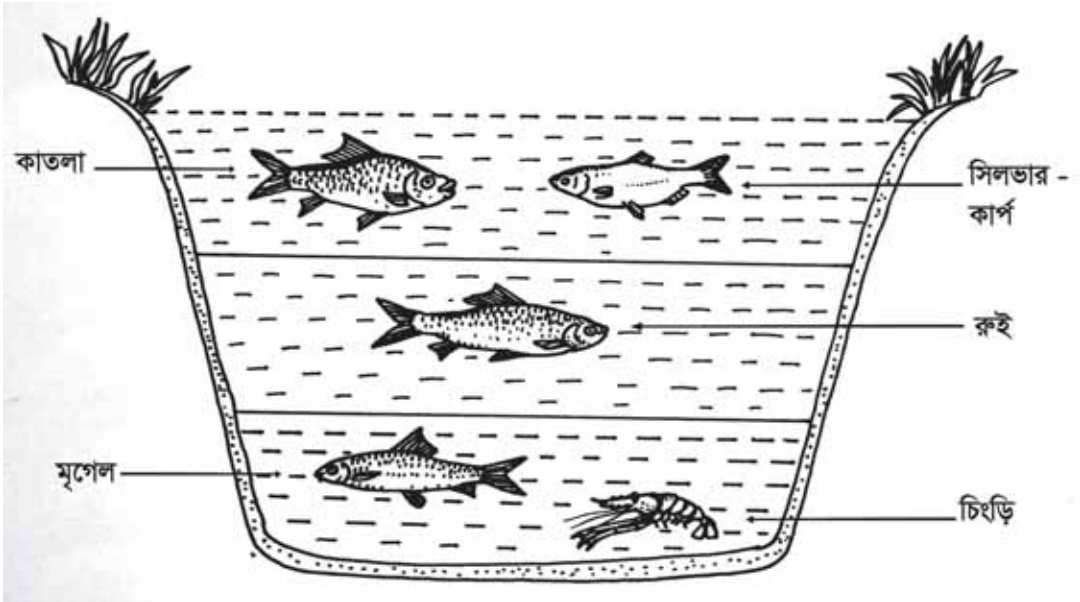

চিত্র : পুকুরে বিভিন্ন ¯Í‡i মাছ

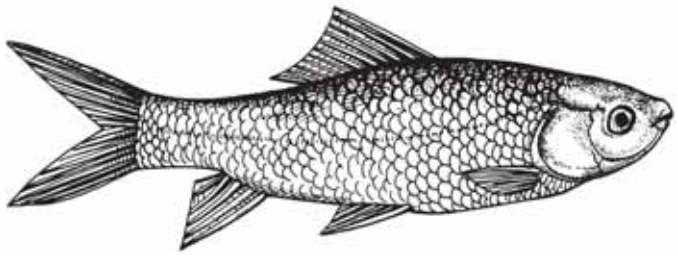

চিত্র : রুই মাছ

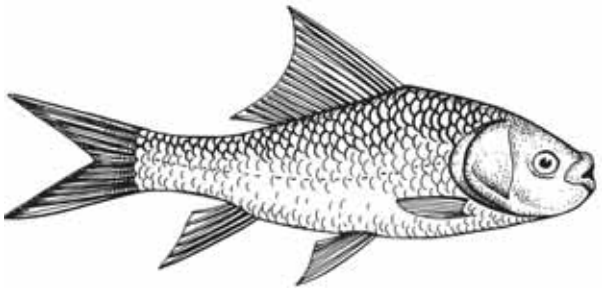

চিত্র : কাতলা মাছ

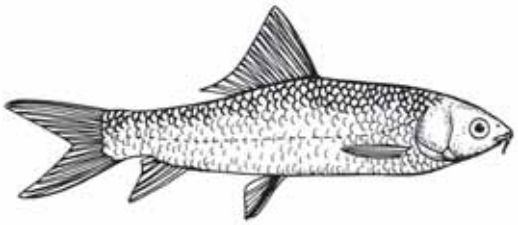

চিত্র : মৃগেল মাছ

মিশ্র চাষের সুবিধা

১। মাছ পুকুরের বিভিন্ন ¯Í‡i থাকে ও খাবার খায় বলে পুকুরের সকল জায়গা ও খাবারের সদ্ব্যবহার হয়।

২। কোনো ¯—‡ii খাবার জমা হয়ে নষ্ট হয় না। ফলে পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকে।

৩। মিশ্র চাষে মাছের রোগবালাই কম হয়।

৪। সর্বোপরি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

নতুন শব্দ : কার্প মাছ, হ্যাচারি।

পাঠ ৮ : মিশ্র চাষের জন্য আদর্শ পুকুর

মিশ্র চাষের জন্য উপযোগী পুকুর নির্বাচনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা n‡"Q-

১। পুকুরটি বন্যামুক্ত হবে। এজন্য পুকুরের পাড় অবশ্যই উঁচু ও মজবুত হবে।

২। পুকুরের পানির গড় গভীরতা ২-৩ মিটার হবে এবং শুকনার সময় পানির গভীরতা হবে কমপক্ষে ১ মিটার।

৩। দো-আঁশ, এঁটেল দো-আঁশ বা এঁটেল মাটির পুকুর সবচেয়ে ভালো। কারণ এ মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি।

৪। ce, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বড় গাছ থাকবে না।

৫। পুকুরটি খোলামেলা হবে যেন প্রচুর আলোবাতাস পায়।

৬। আয়তন ৩০-৫০ শতক হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়।

৭। রাক্ষুসে মাছ ও ক্ষতিকারক পোকামাকড় থাকবে না।

৮। পুকুরে আগাছা থাকবে না।

৯। পুকুরের তলায় বেশি কাদা থাকবে না।

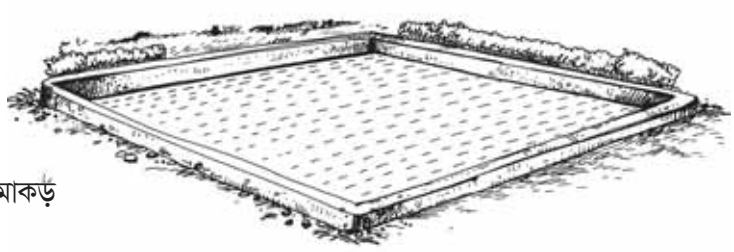

চিত্র : মাছ চাষের জন্য আদর্শ পুকুর

মাছের জীবনধারণের মাধ্যম n‡"Q পানি। পুকুরের পানির গুণাগুণ মাছ চাষে সরাসরি প্রভাব ফেলে। একটি উৎপাদনশীল পুকুরের পানির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো খেয়াল রাখা প্রয়োজন-

১। গভীরতা : মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য n‡"Q পাংকটন। এটি উৎপাদনের জন্য mhv‡jvK দরকার। পুকুরের পানির গভীরতা বেশি হলে mhv‡jvK পানির অতি গভীরে পৌঁছাতে পারে না। তাই পর্যাপ্ত পাংকটন তৈরি হয় না। আবার গভীরতা কম হলে পানি অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে ও পুকুরের তলদেশে আগাছা জন্মাতে পারে।

২। পানির ঘোলাত্ব : পুকুরে ভাসমান কাদা ও মাটির কণা ঘোলাত্ব সৃষ্টি করে। তা ছাড়া বৃষ্টি হলে পুকুরের পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। ফলে পানিতে m‡hi আলো প্রবেশে বাধা পায়, এবং পানিতে খাদ্য তৈরি হয় না। মাছের ফুলকা নষ্ট হয়ে যায়। এ সমস্যা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রতি শতকে ৩০ সে.মি. গভীরতার জন্য ২৪০-২৫০ গ্রাম ফিটকারি অথবা প্রতি শতকে ১.২ কেজি হারে খড় দেওয়া যেতে পারে।

৩। পানির রং : পানির রং ঘন সবুজ হয়ে যাওয়া বা পানির ওপর শেওলার ¯—i পড়া মাছের জন্য ক্ষতিকর। প্রতি শতকে ১২-১৫ গ্রাম তুঁতে ছোট ছোট পোটলা বেঁধে রাখলে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁত পানিতে মিশে শেওলা দমন করে। অতিরিক্ত আয়রন বা লাল শেওলার জন্য পানির ওপর লাল ¯—i পড়তে পারে। এ জন্য পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি হয়। খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে দড়ি তৈরি করে পানির ওপর দিয়ে টেনে তা তুলে ফেলা যায়। পানির রং যদি হালকা সবুজ, লালচে সবুজ ও বাদামি সবুজ হয় তবে বোঝা যাবে যে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য 'পাংকটন' পরিমিত পরিমাণ আছে।

৪। তাপমাত্রা : পানির তাপমাত্রা কমে গেলে `exfZ অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। আবার তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খাদ্য গ্রহণের হার বেড়ে যায়। এজন্য শীতকালে সার ও m¤úiK খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। রুই জাতীয় মাছ ২৫-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালো হয়।

**৫। `exfZ গ্যাস :** মাছ তার শ্বাসকার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পানিতে `exfZ অক্সিজেন থেকে ফুলকার সাহায্যে গ্রহণ করে। পুকুরে বিভিন্ন প্রাণী, D™` ও শেওলার অতিরিক্ত পচন, মেঘলা আবহাওয়া, ঘোলাত্ব, পানিতে অতিরিক্ত লৌহের উপস্থিতির কারণে পুকুরের পানিতে অক্সিজেন কমে যায়। সে সাথে কার্বনডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বিষাক্ত গ্যাস বেড়ে যায়। পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে মাছ পানির ওপর ভেসে মুখ হাঁ করে খাবি খেতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে, সাঁতার কেটে এ অবস্থা `i করা যায়।

কাজ

বাড়ির কাজ হিসাবে শিক্ষার্থীরা মিশ্র মৎস্য চাষ উপযোগী একটি আদর্শ পুকুরের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করবে ও উৎপাদনশীল পুকুরের পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর তালিকাভুক্ত করবে এবং শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।

নতুন শব্দ পরিচিতি : পাংকটন, পানির ঘোলাত্ব, ফুলকা, ফিটকারি, লাল শেওলা।

পাঠ ৯ : মিশ্র চাষের জন্য পুকুর c¯‘wZ

ফসল ফলানোর জন্য চারা রোপণের আগে জমি চাষ, সেচ দেওয়া, সার প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষিজমি c¯‘Z করতে হয়। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগেও তেমনি পুকুর c¯‘Z করে নিতে হয়। মাছ চাষের জন্য পুকুর c¯‘wZi ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

১। পুকুরের পাড় ও তলদেশ মেরামত : পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা উঁচু করে বেঁধে দিতে হবে। পাড়ে বড় গাছপালা থাকলে তার ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এতে করে পুকুরে m‡hi আলো পড়বে ও প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হবে। পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা থাকলে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়। ৩-৪ বছর পর পর একবার পুকুর শুকিয়ে তলার অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলা উচিত ও রোদে পুকুর কয়েকদিন শুকানো উচিত।

২। আগাছা পরিষ্কার : পুকুরে জলজ আগাছা যেমন কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা ইত্যাদি পানিতে মাছের খাদ্য পাংকটনের পুষ্টি শোষণ করে নেয় ও পুকুরে m‡hi আলো পড়তে বাধা দেয়। তাই পুকুরে সব ধরনের জলজ আগাছা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে।

৩। রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ অপসারণ : শোল, গজার, চিতল, বোয়াল ইত্যাদি চাষের মাছ বা পোনা খেয়ে ফেলে। আবার চাষকৃত প্রজাতি ছাড়া অন্য মাছ চাষকৃত মাছের সাথে খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা করে। পুকুরের পানি শুকিয়ে এসব মাছ ধরে ফেলা যায়। পুকুরে পানি কম থাকলে বারবার জাল টেনেও তা করা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সে. মি. গভীরতার জন্য প্রতি শতকে ৩০-৩৫ গ্রাম মাছ মারার বিষ রোটেনন পাউডার পানিতে

গুলে mg¯— পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর জাল টেনে পুকুরের পানি ওলটপালট করে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর mg¯Í মাছ পানির ওপর ভেসে উঠলে তা তুলে ফেলতে হবে। রোটেনন ব্যবহার করা মৃত মাছ খাওয়া যাবে।

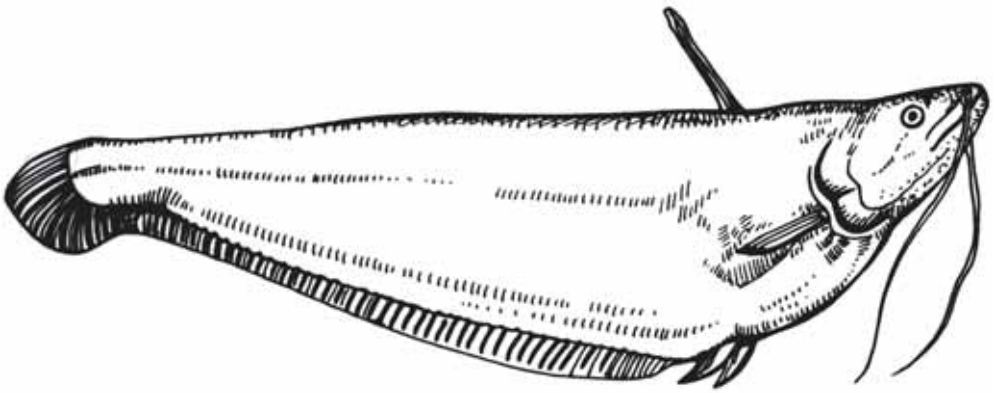

চিত্র : বোয়াল মাছ

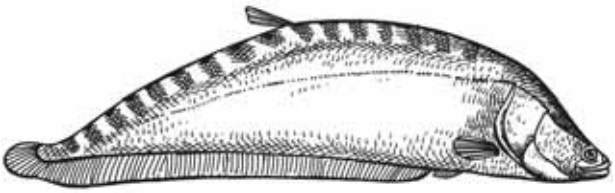

চিত্র : চিতল মাছ

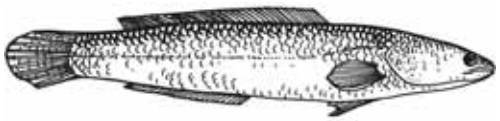

চিত্র : শোল মাছ

৪। চুন প্রয়োগ : পুকুর শুকনা হলে প্রতি শতকে ১-২ কেজি হারে চুন পাউডার করে তলায় ছিটিয়ে দিতে হবে। পুকুরে পানি থাকলে বালতি বা ড্রামে গুলে ঠাণ্ডা করে mg¯— পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে। চুন মাটি ও পানি জীবাণু মুক্ত করে ও উর্বরতা বৃদ্ধি করে, পানির ঘোলাটে অবস্থা `i করে এবং তলদেশের বিষাক্ত গ্যাস `i করে।

৫। সার প্রয়োগ : পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য সার প্রয়োগ করতে হয়। চুন প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর সার দিতে হবে। জৈব সারের জন্য পুকুরে প্রতি শতকে ৫-৭ কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা এবং অজৈব সারের মধ্যে প্রতি শতকে ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টিএসপি ও ২০-৩০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানিতে প্রকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

কাজ

শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে সাথে নিয়ে পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরের পাড়ে গিয়ে পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা করবে।

পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা : সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরের পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে। এজন্য ২০ সে.মি. ব্যাসযুক্ত টিনের তৈরি একটি সাদা-কালো থালা (সেকিডিস্ক) সুতা দ্বারা পানিতে ডোবানোর পর যদি ২৫-৩০ সে.মি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে। অথবা হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। অন্যথায় পুনরায় কিছু সার দিয়ে ২-৩ দিন পর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না দেখতে হবে।

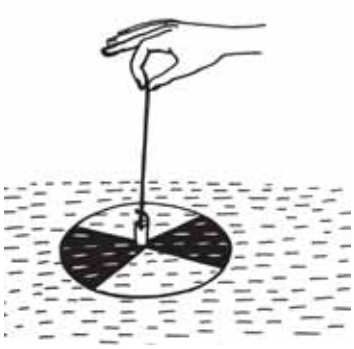

চিত্র : সেকিডিস্ক পরীক্ষা

চিত্র : হাত পরীক্ষা

নতুন শব্দ : সেকিডিস্ক, হাত পরীক্ষা।

পাঠ ১০ : পোনা মজুদ এবং মজুদ পরবর্তী পরিচর্যা

পোনা মজুদ : পুকুরে পোনা ছাড়ার জন্য নিকটবর্তী কোনো সরকারি বা বেসরকারি হ্যাচারি বা নার্সারি খামার থেকে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। কাছাকাছি স্থানে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যায়। `ieZx স্থানের ক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। পোনা এনে সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। এ সময় অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে। এতে করে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। এরপর পলিব্যাগ বা পাত্র কাত করে পোনা A\‡¯— A\‡¯— পুকুরে ছাড়তে হবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরে ৭-১০ সে.মি. আকারের পোনা শতকে ৫৫-৬০টি মজুদ করা যায়। কাতলা ২৫-২৬টি, রুই ১৫-১৭টি, মৃগেল ১৫-১৭টি মজুদ করা যেতে পারে।

মজুদ-পরবর্তী পরিচর্যা :

১। সার প্রয়োগ : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতির খাদ্য না থাকলে মাছের বৃদ্ধি ভালো হয় না। তাই পুকুরে দৈনিক অথবা প্রতি সপ্তাহে একবার নিয়মিত সার দেওয়া উচিত। সার পানির সাথে গুলে পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চিত্র : পুকুরে পোনা ছাড়ার নিয়ম

পুকুরে সার প্রয়োগের তালিকা

সারের নাম	মাত্রা (শতকে দৈনিক)	মাত্রা (শতকে সপ্তাহে)
গোবর অথবা	১৫০-২০০ গ্রাম	২-২.৫ কেজি
হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা	৫০-১০০ গ্রাম	১-১.৫ কেজি
ইউরিয়া	৩-৫ গ্রাম	৪০-৫০ গ্রাম
টিএসপি	১-২ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম

২। m¤úiK খাদ্য সরবরাহ : পুকুরে পোনা মজুদের পর থেকেই দৈনিক m¤úiK খাবার সরবরাহ করতে হবে। সুষম খাবার তৈরির জন্য ফিশমিল, সরিষার খৈল, গমের fwm/Pv‡ji কুঁড়া, আটা ও ভিটামিন যথাক্রমে ২০ ঃ ৩০ ঃ ৪৫ ঃ ৪.৫ ঃ ০.৫ অনুপাতে মিশিয়ে খাবার তৈরি করে মাছকে দেওয়া যায়। খাবার দেওয়ার ১০-১২ ঘণ্টা আগে খৈল ভিজিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা খৈলের সাথে বাকি উপাদানগুলো অল্প পানি দিয়ে মিশিয়ে মড তৈরি করে বল আকারে পুকুরের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে। দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সমান দু'ভাগে ভাগ করে সকালে ও বিকালে দিতে হবে। এ ছাড়া বাজার থেকে কেনা কারখানায় তৈরি মৎস্য খাদ্যও পুকুরে সরবরাহ করা যেতে পারে। পুকুরে প্রতিদিন মজুদকৃত মাছের মোট ওজনের ২-৫ ভাগ হারে এবং শীতের সময় ১-২ ভাগ হারে খাবার দিলেই চলে।

৩। মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা : পুকুরে মাছ চাষের সময় বিভিন্ন কারণে মাছের রোগ হতে পারে। পুকুরের পরিবেশ খারাপ হলে মাছ সহজেই রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় ও মারা যেতে পারে। ফলে মাছ চাষ লাভজনক হয় না। চাষকালীন সময়ে মাছের ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, পেটফোলা রোগ এবং মাছের দেহে উকুনের আক্রমণ হতে পারে। রোগ হলে মাছ পানির উপরিভাগে অস্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটে, খাবার

গ্রহণ কমিয়ে দেয় বা বন্ধ করে দেয়, ফুলকার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়, মাছের দেহে বিভিন্ন দাগ বা ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। মাছে রোগ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগাক্রান্ত মাছ পুকুর হতে সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রাথমিকভাবে পুকুরে শতকে ১ কেজি চুন বা ২৫-৩৫ গ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দেওয়া যেতে পারে। অথবা ১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম লবণ গুলিয়ে তাতে মাছগুলোকে ১ মিনিট গোসল করিয়ে আবার পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে।

কাজ : শিক্ষক শ্রেণিতে মিশ্র মাছ চাষে m¤úiK খাদ্য প্রয়োগের ওপর ভিডিও দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে কাজ প্রদান করবেন।

মাছ আহরণ : রুই, কাতলা, মৃগেল মাছ ১ বছর বয়স পর্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও দৈহিক বৃদ্ধি সে হারে ঘটে না। এ জন্য নির্দিষ্ট বয়সে মাছ ধরে ফেলতে হবে। তা না হলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে। কাতলা ৭-১২ মাসের মধ্যে ওজনে ১-১.৫ কেজি হয়, রুই মৃগেল মাছ ৯-১২ মাসের মধ্যে ওজন ৭০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি পর্যন্ত হয়।

নতুন শব্দ : পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট।

পাঠ ১১ : চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি

চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অতি ¸iZcY মৎস্যm¤ú`। ২০০৯-১০ সালে হিমায়িত চিংড়ি থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০ হাজার মে.টন যা মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্পের পরেই চিংড়ির স্থান। চিংড়ি শিল্পের কাঁচামাল যেমন চিংড়ির পোনা এ দেশের প্রাকৃতিক উৎস ও হ্যাচারি থেকে সহজেই পাওয়া যায়। তাই এ শিল্পে স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা করা যায়। চিংড়ি চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব। এ দেশের মিঠা ও লোনা পানিতে প্রায় ৬৭ প্রজাতির চিংড়ি পাওয়া যায়। এদের সবগুলোই লাভজনকভাবে চাষোপযোগী নয়। আমাদের দেশে বাণিজ্যিকভাবে সবচেয়ে ¸iZcY চাষোপযোগী মিঠাপানির চিংড়ি প্রজাতিটি n‡"Q গলদা চিংড়ি এবং লোনাপানির প্রজাতিটি হ"Q বাগদা চিংড়ি। গলদা চিংড়ির মাথা ও দেহ প্রায় সমান। পুরুষ গলদার ২য় জোড়া পা বেশ বড়। অপরদিকে বাগদা চিংড়ির মাথা দেহের থেকে ছোট হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে চাষের মাধ্যমে চিংড়ি উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭৫ হাজার মে.টন। এখানে আমরা মিঠা পানিতে গলদা চিংড়ি চাষ পদ্ধতি m¤ú‡K জানব। গলদা একক চাষ ছাড়াও কার্প জাতীয় মাছের সাথে মিশ্রচাষ করা যায়।

গলদা চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন : ছোট-বড় সব পুকুরেই গলদা চিংড়ি চাষ করা যায়। তবে বড় পুকুর গলদা চিংড়ি চাষের জন্য সুবিধাজনক। গলদা চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন-

১। পুকুরটি খোলামেলা হবে যেন পর্যাপ্ত m‡hi আলো পায়।

২। পুকুরের মাটি এঁটেল, দোঁ-আশ বা বেলে দোঁ-আশ হলে ভালো হয়।

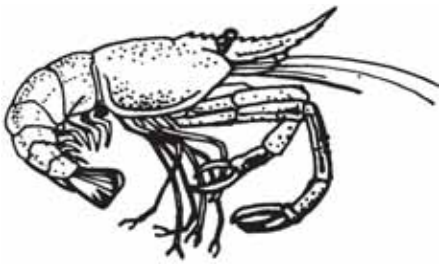

চিত্র : গলদা চিংড়ি

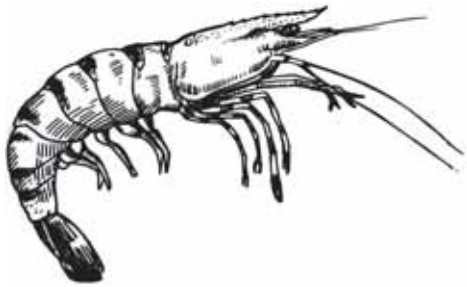

চিত্র : বাগদা চিংড়ি

৩। পুকুরের পানির গভীরতা ১-১.২ মিটার হওয়া দরকার।

৪। পুকুরে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে।

৬। পুকুরের পানি দূষণমুক্ত হতে হবে।

কাজ

শিক্ষার্থীরা "অর্থনৈতিক ফসল হিসাবে চিংড়ির গুরুত্ব" দলগতভাবে লিখে উপস্থাপন করবে।

পুকুর প্রস্তুতি : আমরা আগের অধ্যায়ে মাছ চাষের জন্য পুকুর c¯'wZ m¤ú‡K জেনেছি। মিঠা পানিতে চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর c¯'wZI প্রায় অনুরূপ। নিচে সংক্ষেপে চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর c¯'wZi বিভিন্ন ধাপ উলেখ করা হলো-

১। পুকুরের পাড় ভাঙা থাকলে তা মেরামত করতে হবে এবং তলদেশের অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে।

২। রাক্ষুসে ও অচাষযোগ্য মাছ থাকলে পুকুর শুকিয়ে অথবা রোটেনন ব্যবহার করে তা অপসারণ করতে হবে।

৩। পুকুরের ভাসমান ও অন্যান্য জলজ আগাছা `i করতে হবে।

৪। পুকুরে শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন মাটি ও পানির অম্লতা `i করে, পানির ঘোলাত্ব `i করে ও সারের কার্যকারিতা বাড়ায়।

৫। চুন দেওয়ার ৭-১০ দিন পর পুকুরে সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুর c¯'wZKvjxb সারের পরিমাণ m¤ú‡K ইতিমধ্যেই আমরা আগেi অধ্যায়ে জেনেছি।

bZb kã : গলদা চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, চাষ অযোগ্য মাছ, রাক্ষুসে মাছ।

পাঠ ১২ : পোনা মজুদ ও মজুদ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সার দেওয়ার ৩-৫ দিন পর পুকুরের পানির রং হালকা সবুজ হলে পোনা মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের একদিন আগে গলদা চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থল স্থাপন করতে হবে। কারণ চিংড়ি একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর খোলস বদলায়। খোলস ছাড়ার মাধ্যমেই চিংড়ির বৃদ্ধি ঘটে। খোলস বদলের সময় চিংড়ি দুর্বল থাকে। এ সময় চিংড়ি নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চায়। এ জন্য নারিকেল, তাল, খেজুর গাছের শুকানো পাতা, ডালা পালা ও বাঁশের টুকরো পুকুরের তলদেশে স্থাপন করতে হয় যা চিংড়ির আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করে।

প্রাকৃতিক উৎস বা হ্যাচারি হতে সংগৃহীত ১০-১৫ সে.মি. আকারের পোনা পানির সাথে খাপ খাইয়ে সাবধানে পুকুরে ছাড়তে হবে। অত্যধিক রোদ বা বৃষ্টির মধ্যে পোনা মজুদ করা উচিত নয়। একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ১০-৩০ হাজার পোনা ছাড়া যায়।

পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ : পুকুরে পোনা মজুদের পর নিয়মিত পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। দুই-তিন মাস পর পুকুরের পানি বেশি সবুজ হলে অথবা চিংড়ির অস্বাভাবিক আচরণ দেখা গেলে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ : প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য cK‡i সার দেওয়া দরকার। এ জন্য পুকুরে প্রতিদিন শতক প্রতি গোবর ১৫০-২০০ গ্রাম, ইউরিয়া ৩-৫ গ্রাম , টিএসপি ১-২ গ্রাম ও এমপি ০.৫-১ গ্রাম দেওয়া যেতে পারে। সকালে সূর্যের আলো পড়ার পর সার প্রয়োগ করতে হবে। পানির রং অতিরিক্ত সবুজ হলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা : চিংড়ির ভালো উৎপাদন পাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্যের পাশাপাশি m¤úiK খাবার দেওয়া দরকার। সুষম m¤úiK খাদ্য তৈরির জন্য চালের কুঁড়া বা গমের ভুসি, খৈল, ফিশমিল, শামুক বা ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া, লবণ ও ভিটামিন মিশ্রণ একসাথে মিশিয়ে বল তৈরি করে পুকুরে দেওয়া যায়। পুকুরে বিদ্যমান চিংড়ির মোট ওজনের ৩-৫ ভাগ হারে প্রতিদিন খাদ্য দিতে হবে। এ ছাড়া শামুক বা ঝিনুকের মাংস কুচি কুচি করে কেটে প্রতিদিন একবার করে দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বল আকারে তৈরি ভেজা খাদ্য পুকুরের নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্যদানিতে করে দিতে হবে। প্রতিদিনের খাবারকে দুভাগ করে সকালে ও সন্ধ্যায় পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

চিংড়ির m¤úiK খাদ্যতালিকা

ক্রমিক নং	খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ (%)
১	চালের কুঁড়া বা গমের fwm	৪০-৬০
২	খৈল	১০-২০
৩	ফিশমিল	২০-৩০
৪	শামুক বা ঝিনুকের খোলসের গুঁড়া	৯.৫
৫	লবণ	০.২৫
৬	ভিটামিন মিশ্রণ	০.২৫

কাজ : চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য ও m¤úiK খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দলগতভাবে আলোচনা করে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

রোগ প্রতিরোধ : দূষিত পরিবেশ, রোগাক্রান্ত পোনা মজুদ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে চিংড়িতে রোগ হতে পারে। তবে রোগবালাইয়ের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই উত্তম। সুস্থ-সবল পোনা মজুদ ও ভালো ব্যবস্থাপনা করা গেলে রোগের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। চাষকালীন চিংড়ির কয়েকটি সাধারণ রোগ হ"Q খোলস, লেজ ও ফুলকায় কালো দাগ রোগ, খোলস নরম রোগ, চিংড়ির গায়ে শেওলা সমস্যা, পেশি সাদা ও হলদে হয়ে যাওয়া। চিংড়িতে রোগ দেখা দিলে প্রথমেই দ্রুত পানি পরিবর্তন করে নতুন পানি দিতে হবে। পুকুরের পানিতে শতকে ১ কেজি পরিমাণ পাথুরে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

নতুন শব্দ পরিচিতি : চিংড়ির আশ্রয়স্থল, ফিশমিল।

পাঠ ১৩ : মাছ সংগ্রহ ও বাছাই

মাছ দ্রুত পচনশীল দ্রব্য। মাছ ধরার পর তার গুণগত মান ভালো রেখে ক্রেতার কাছে পৌঁছানোর জন্য সতর্কতার সাথে সংগ্রহ, বাছাই ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তাজা মাছকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে দ্রুত পচনক্রিয়া ঘটে। মাছ সংগ্রহ ও বাছাইয়ের সময় যত্নসহকারে নাড়াচাড়া করতে হয় যেন মাছ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। মাছের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেন সহজেই ধুয়ে পরিষ্কার করা যায় এবং মাছকে ক্ষতিগ্র¯— না করে এমন হতে হবে। আঘাত পাওয়া মাছ, পচা বা রোগাক্রান্ত মাছ দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে। মাছকে সূর্যালোকের নিচে দীর্ঘক্ষণ রাখা উচিত নয়। বড় মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে রক্ত ঝরতে দিতে হবে। এ জন্য মাছের ওপর পানির প্রবাহ দেওয়া যেতে পারে। মাছকে বিচিং পাউডার যুক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে নিলে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক কমে যায়। এ জন্য পানিতে লিটার প্রতি ২৫-৩০ মিলিগ্রাম বিচিং পাউডার মেশাতে হয়। বিচিং পাউডার পাওয়া না গেলে পরিষ্কার ট্যাপ বা টিউবওয়েলের পানি ব্যবহার করতে হবে। বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মাছকে প্রজাতি ও আকার অনুযায়ী আলাদা করা যায়। আবার মাছের গুণাগুণের ওপর ভিত্তি করেও একে বিভিন্ন মান বা গ্রেডে ভাগ করা যায়। যেমন-

গ্রেড	বাহ্যিক অবস্থা	পেশি	ফুলকা	চোখ	মান বা গ্রেড
১	উজ্জ্বল ও চকচকে স্বাভাবিক রং	দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ আঙুলে চাপ দিলে সাথে সাথে ফিরে আসে	গাঢ় লাল	উজ্জ্বল, চকচকে ও লেন্স উঁচু স্ব"Q	উত্তম
২	ঔজ্জ্বল্য নেই, হালকা লালচে হলুদ	শক্ত ও চাপ দিলে দেবে যায় না	বাদামি বা ধূসর	চোখ বিবর্ণ ও ঢোকানো, পাতা ঘোলাটে, সামান্য রক্তাভ	মাঝারি বা সন্তোষজনক
৩	লালচে হলুদ	পেশি সামান্য নরম এবং চাপ দিলে ডেবে যায়	বাদামি ও দুর্গন্ধ	বিবর্ণ ও ডোবানো, পাতা ঘোলাটে রক্তময়	নিম্নমান

কাজ

শিক্ষক বাজার থেকে একই মাছের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর সাহায্যে সেগুলোর গুণাগুণ পরীক্ষা করে বিভিন্ন মান বা গ্রেডে বিভক্ত করাবেন।

মাছ সংগ্রহ বা বাছাইয়ের পর বরফের সাহায্যে সংরক্ষণ করে বাজারজাত করা হয়। আমাদের দেশে মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফের বককে গুঁড়া করে ব্যবহার করা হয়। প্রতি ১ ভাগ মাছের জন্য ২ ভাগ বরফ দিতে হয় এবং শীতকালে প্রতি ১ ভাগ মাছের জন্য ১ ভাগ বরফ দিলেই চলে। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাঁশের চাটাই কিংবা মাদুরের তৈরি ঝুড়িতে বরফ ও মাছ ¯—‡i ¯—‡i সাজিয়ে একটি মাদুর বা চটের টুকরো দিয়ে ঢেকে সেলাই করে দেওয়া হয় এবং পরে কাঠের বাক্সে `ieZx স্থানে পরিবহন করা হয়। `‡i মাছ পরিবহনের জন্য শীতলীকৃত ভ্যান ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। কাছাকাছি পরিবহনের জন্য তাপ প্রতিরোধী বরফ বাক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন।

নতুন শব্দ পরিচিতি : বিচ্চিং পাউডার, সংক্রমণ, স্থিতিস্থাপক।

পাঠ ১৪ : গরু পালন পদ্ধতি ও পরিচর্যা

গবাদিপশুর দুধ ও মাংস উৎপাদন লাভজনক করার জন্য সুবিধামতো পালন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। আমাদের দেশে সনাতন পদ্ধতিতে গরু পালন করা হয়। এখানে সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। কৃষক সাধারণত পশুকে গোয়ালে রেখে, কখনো খুঁটা দিয়ে বেঁধে বা চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে পালন করে থাকে। তাই তিন পদ্ধতিতে পশু পালন করা যায়।

১। গোয়াল ঘরে পালন ২। বাইরে বেঁধে পালন ৩। চারণ fwg‡Z পালন

গোয়াল ঘরে রেখে পালন : আধুনিক গোয়াল ঘর তৈরি করে পশুকে m¤úY আবদ্ধ অবস্থায় পালন করা যায়। গোয়াল ঘর তৈরি করার সময় পশুর সংখ্যার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। পশুর সংখ্যা ৯ বা তার কম হলে এক সারিবিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার বেশি হলে দুই সারিবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে। ঘর তৈরির সময় প্রতিটি গরুর জন্য খাদ্য সরবরাহের পথ, চাড়ি, পশু দাঁড়ানোর স্থান, নর্দমা ও পশু চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এখানে পশুকে তার প্রয়োজনীয় সকল খাদ্য, যেমন- কাঁচা ঘাস, খড়, ^Lj-fwm ও পানি সরবরাহ করা হয়। পশুকে চারণ fwg বা বাইরে বাঁধার জায়গা না থাকলে এ পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন করা হয়। এখানে পশু কম আলো-বাতাস পায় এবং mhv‡jvK থেকে ewÂZ হয়।

বাইরে বেঁধে পালন : গোয়াল ঘরে পশুকে সবুজ ঘাস সরবরাহ করা সম্ভব না হলে বিকল্প বিষয় চিন্তা করতে হয়। এক্ষেত্রে সবুজ ঘাস রয়েছে এমন iv¯—v, বাগান বাড়ি বা মাঠে গরুকে বেঁধে ঘাস খাওয়ানো যায়। পশুকে শক্তভাবে বাঁধতে না পারলে অন্যের জমির ফসল নষ্ট করে থাকে। তাই পশু পালনকারীকে এদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চারণ fwg‡Z পালন : যেসব দেশে অনেক কৃষিজমি রয়েছে সেখানে তারা পশুর জন্য উন্নত জাতের ঘাসের চাষ করে থাকে। সাধারণত †Mvm¤ú‡` উন্নত দেশগুলোই পরিকল্পিতভাবে পশুর জন্য চারণ fwg তৈরি করে থাকে। পশু তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস চারণ fwg‡Z চরে খেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ^Lj-fwm ও পানি গোয়াল ঘরে সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

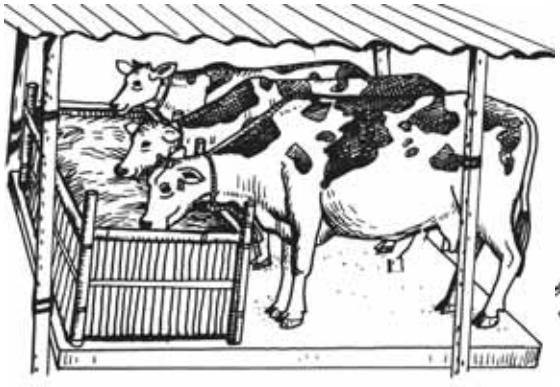

চিত্র : গোয়াল ঘরে পালন

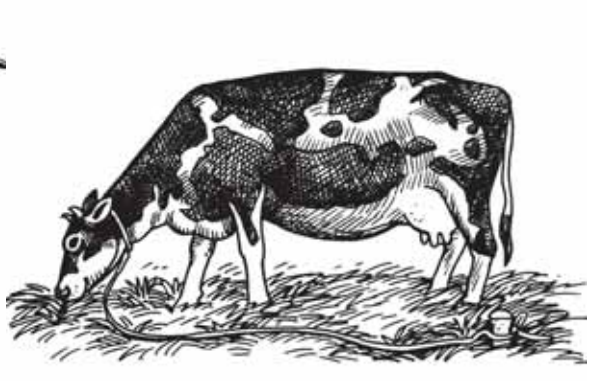

চিত্র : বাইরে বেঁধে পালন

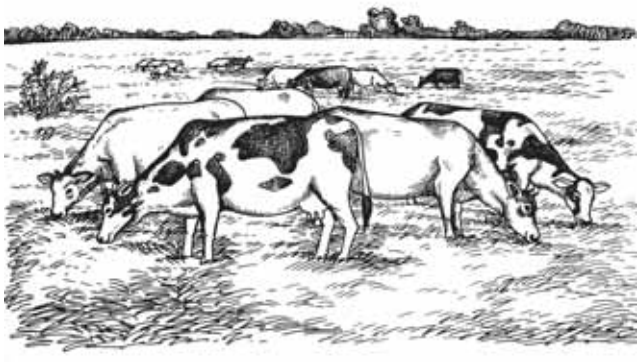

চিত্র : চারণ fwg‡Z পালন

কাজ

তোমাদের গ্রামে কোন পদ্ধতিতে গরু পালন করা হয় এবং এর সুবিধা বা অসুবিধা লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

পশুর পরিচর্যা : পশুকে আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন করতে হয়। পশুর সার্বিক যত্নকে পরিচর্যা বলে। দুধেল গাভীর দৈনন্দিন পরিচর্যার অভাব হলে দুগ্ধ উৎপাদন কমে যায়। খামারের বাছুর, বাড়ন্ত গরু ও গর্ভবতী পশুর বিশেষ যত্ন নিতে হয়। পশুর সঠিক পরিচর্যার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

১। দৈনিক পশুর গোবর, মূত্র ফেলে দিয়ে বাসস্থান পরিষ্কার-cwi”Qb রাখতে হবে।

২। চাড়ি থেকে বাসি খাদ্য ফেলে দিয়ে তাজা খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

৩। দৈনিক পর্যাপ্ত পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।

৩। পশুর শরীর পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত গোসল ও প্রয়োজনে ব্রাশ করতে হবে।

৪। পশুকে প্রজনন, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন যত্ন নিতে হবে।

৫। দোহনকালে গাভীকে বিরক্ত করা যাবে না।

৬। বাছুরের বিশেষ যত্ন নিতে হবে এবং বাছুর যাতে পরিমিত দুধ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নতুন শব্দ পরিচিতি : সনাতন পদ্ধতি, পরিচর্যা, গর্ভকালীন, প্রসবকালীন।

পাঠ ১৫ : গরু পালনের জন্য একটি আদর্শ গোয়াল ঘর

মানুষের মতো পশুপাখিদের আশ্রয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য এবং অধিক উৎপাদনের জন্য পশুর জন্য ঘর তৈরি করতে হয়। পশুকে থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয় তাকে গোয়াল ঘর বলে। গোয়াল ঘরে পশুকে ২৪ ঘণ্টা আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে আলো বাতাসে ঘুরিয়ে আনা পশুর স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

একটি আদর্শ গোয়াল ঘরের স্থান নির্বাচন : পারিবারিক বা বাণিজ্যিক যে উদ্দেশেই গরু পালন করা হোক না কেন খামারিকে গোয়াল ঘরের স্থান নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত welqmgn বিবেচনা করতে হবে।

১। গোয়াল ঘর উঁচু স্থানে করতে হবে।

২। পশুর সংখ্যার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

৩। গোয়াল ঘর মানুষের বাসস্থান থেকে `‡i হবে।

৪। গোয়াল ঘর বা খামার এলাকা থেকে সহজে পানি নিষ্কাশন হতে হবে।

৫। গোয়াল ঘরের চারপাশ পরিষ্কার হবে।

৬। গোয়াল ঘরে যেন mhv‡jvK পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৭। পশুর জন্য খাদ্য ও পানি সরবরাহের বিষয়টি মনে রাখতে হবে।

৮। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গোয়াল ঘর তৈরির সময় বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করতে হবে।

পশুর বাসস্থান বা গোয়াল ঘরের অনেক সুবিধা রয়েছে। গোয়াল ঘরে একক বা দলগতভাবে পশু পালন করলে ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে আসে। নিম্নে গোয়াল ঘর বা খামারে পশু পালন করার সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো।

১। পশুর একক ও নিবিড় যত্ন নেওয়া সহজ হয়।

২। পশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস পাওয়া যায়।

৩। রোদ, বৃষ্টি ও ঝড় থেকে পশুকে রক্ষা করা যায়।

৪। পোকামাকড় ও বন্য পশুপাখি থেকে রক্ষা করা যায়।

৫। খাদ্য ও পানি সরবরাহ সহজ হয়।

৬। দুগ্ধ দোহন সহজ হয়।

৭। গোয়াল ঘরে রাখার কারণে পশু শান্ত হয়ে ওঠে।

৮। রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয়।

৯। চিকিৎসাসেবা সহজ হয়।

১০। সহজে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করা।

১১। গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা সহজ হয়।

১২। শ্রমিক কম লাগে ও উৎপাদন খরচ কমে আসে।

গোয়াল ঘরের আকার পশুর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। পশুর সংখ্যা ১০-এর কম হলে ১ সারিবিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা তার অধিক হলে ২ সারিবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে।

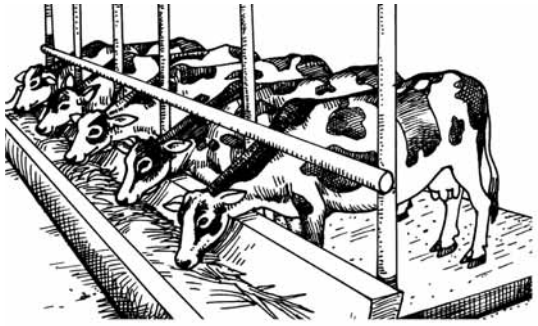

চিত্র : এক সারিবিশিষ্ট গোয়াল ঘর

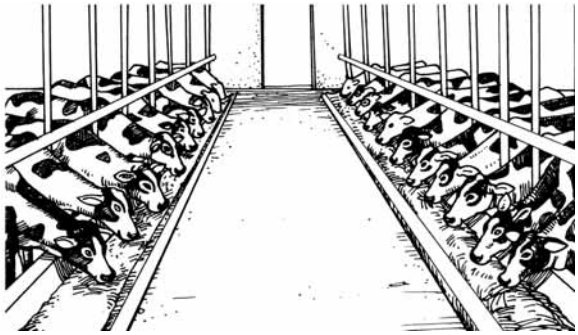

চিত্র : দুই সারি বিশিষ্ট গোয়াল ঘর

কাজ
শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে চার ভাগ হয়ে 'আদর্শ গোয়াল ঘর কেন প্রয়োজন'-এ বিষয়ে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

bZb kã cwiwPwZ : নিবিড় যত্ন।

পাঠ ১৬ : গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গরু জাবরকাটা প্রাণী হওয়ায় বেশি পরিমাণ আঁশ জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। এদের খাদ্য হিসাবে সবুজ ঘাস, খড় ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। দেশি গরু কম দুধ উৎপাদন করায় অনেকে কোনো দানাদার খাদ্য সরবরাহ করে না। কিন্তু উন্নত জাতের সংকর গাভি বেশি দুধ উৎপাদন করায় সবুজ ঘাস ও খড়ের সাথে অবশ্যই পরিমিত দানাদার খাবার সরবরাহ দিতে হয়।

সবুজ ঘাস : সবুজ ঘাসই গাভীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু এদেশে চারণভূমি ও খোলা সবুজ মাঠ না থাকায় পশুর সবুজ ঘাসের অভাব লেগেই থাকে। তাই বাড়ির পাশের পতিত জমি, পুকুরপাড়, i¯—v ও রেললাইন ও বাঁধের ধারে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করতে হবে। উন্নত জাতের ঘাস হিসাবে নেপিয়ার, পারা, জার্মান, গিনি এবং দেশি ঘাস চাষ করা যেতে পারে। তাছাড়া গরুকে সবুজ ঘাসের পরিবর্তে সুবিধামতো কোনো গাছের পাতা যেমন, ইপিল-ইপিল, আমপাতা, কলাপাতা, কাঁঠাল পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি খাওয়ানো যায়। রান্না-ঘরের বিভিন্ন

তরিতরকারি ও ফলের খোসা ফেলে না দিয়ে পশুকে সরবরাহ করা যেতে পারে। উন্নত ও সংকর জাতের গাভির ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩-৪ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে। তাই ওজনভেদে একটি গরুকে দৈনিক ১২-১৫ কেজি সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হয়।

খড় : আমাদের দেশে শুধু সবুজ ঘাস দিয়ে গরু পালন করা যায় না। তাই ঘাসের সাথে ধানের খড় সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ও সংকর জাতের গাভির ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ কেজি খড় সরবরাহ করতে হবে। তাই ওজনভেদে একটি গরুকে দৈনিক ৩-৫ কেজি খড় সরবরাহ করতে হয়। ধানের খড়কে কেটে পানিতে ভিজিয়ে নরম করলে পশুর জন্য খেতে ও হজম করতে সুবিধা হয়। খড়কে এককভাবে না দিয়ে খড়ের সাথে খৈল, fwm, ভাতের মাড় ও ২০০-৩০০ গ্রাম ঝোলা গুড় মিশিয়ে খাওয়ালে গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়।

দানাদার খাদ্য : গবাদিপশুর জন্য বিভিন্ন দানাশস্য ও এদের DcRvZmgn‡K দানাদার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাভিকে দৈনিক যে পরিমাণ দানাদার খাদ্য দিতে হয় তা দুই ভাগ করে সকালে ও বিকালে দুধ দোহনের আগে সরবরাহ করতে হবে। উন্নত ও সংকর গাভির ক্ষেত্রে প্রথম ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য ২ কেজি দানাদার এবং পরবর্তী প্রতি ৩ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য আরও ১ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। যদি একটি গাভি দৈনিক ৯ লিটার দুধ দেয় তবে প্রথম ৩ লিটারের জন্য ২ কেজি এবং পরবর্তী ৬ (৩+৩) লিটারের জন্য আরও (১+১) ২ কেজিসহ সর্বমোট (২+২) ৪ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

কাজ

একটি জার্সি গাভি দৈনিক ১২ লিটার দুধ দিলে তাকে কী পরিমাণ দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে- এককভাবে তা হিসাব করে শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

গাভির দানাদার খাদ্যতালিকা নিচে দেওয়া হলো-

দানাদার খাদ্য	পরিমাণ %
গমের fwm	৪০
চালের কুঁড়া	২০
ভুট্টার গুঁড়া	২০
সরিষার খৈল	২০
মোট	১০০%

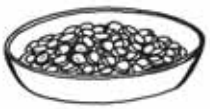

ভুট্টা

খৈল

হাড়ের গুঁড়া

গম ভাঙা

খনিজ লবণ : একটি দুধেল গাভিকে দৈনিক ১০০-১২০ গ্রাম লবণ ও ৫০-৬০ গ্রাম হাড়ের গুঁড়া সরবরাহ করতে হবে।

পানি : একটি উন্নত জাতের গাভি দৈনিক ৪০ লিটার পানি পান করতে পারে। তাই পশুকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।

bZb kã cwiwPwZ : আঁশ জাতীয় খাদ্য, দানাদার খাদ্য, সংকর গাভি, ঝোলা গুড়।

পাঠ ১৭ : গরুর বিভিন্ন প্রকার রোগ

গরু আমাদের অনেক উপকারে আসে। কিন্তু এসব পশু মানুষের মতো বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশুর দুধ, মাংস এবং কর্মক্ষমতা কমে যায়। অনেক পশু যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে মারাও যায়। তাই পশু পালনকারীর রোগ m¤ú‡K সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। এ পাঠে গরুর রোগ ও রোগ পরিচিতি বর্ণনা করা হলো।

রোগ : পশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের বিচ্যুতিকে রোগ বলা হয়। রোগাক্রান্ত পশুর খাদ্য গ্রহণ কমে যাবে। পশু ঝিমাতে থাকবে। প্রশ্রাব ও পায়খানায় সমস্যা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এদের শরীরের লোম খাড়া দেখায় ও তাপ বেড়ে যায়। গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এদের †iwMmgn‡K প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-

ক। সংক্রামক রোগ

খ। পরজীবীজনিত রোগ

গ। অপুষ্টিজনিত রোগ ও

ঘ। অন্যান্য সাধারণ রোগ

চিত্র : একটি অসুস্থ গরু

ক। সংক্রামক রোগ : যে সকল রোগ রোগাক্রান্ত পশু হতে সুস্থ পশুর দেহে সংক্রমিত হয় তাকে সংক্রামক রোগ বলে। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার কারণে পশুতে এ সকল রোগ হয়ে থাকে। উলিখিত রোগের মধ্যে সংক্রামক রোগই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক। সংক্রামক রোগের মধ্যে আবার ভাইরাসজনিত রোগ পশুর বেশি ক্ষতি করে থাকে, যেমন- খুরা-রোগ, জলাতঙ্ক, গোবসন্ত ইত্যাদি। ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক রোগের মধ্যে গবাদিপশুতে বাদলা, তড়কা, গলাফোলা, ওলান-ফোলা, বাছুরের নিউমোনিয়া ও ডিপথেরিয়া ইত্যাদি রোগ বেশি উলেখযোগ্য।

খ। পরজীবীজনিত রোগ : যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী বড় প্রাণীর দেহে আশ্রয় নেয় তাদেরকে পরজীবী বলে। এরা আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও eskwe¯—vi করে। পরজীবীকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা-

১) বহিঃপরজীবী–যেমন, উকুন, মশা, মাছি, আটালি, মাইট ইত্যাদি পশুর চামড়ার ওপর বাস করে এবং দেহ হতে রক্ত শোষণ করে পশুর ক্ষতি করে থাকে।

২) দেহাভ্যন্তরের পরজীবী : এরা পশুর দেহের ভেতর বাস করে, যা কৃমি নামে পরিচিত। কৃমি দেখতে পাতা, ফিতা ও গোল বলে এদেরকে পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি বলা হয়। এরা আশ্রয়দাতার দেহের ভেতর হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পশুকে রোগাক্রান্ত করে তোলে।

গ। অপুষ্টিজনিত রোগ : আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও পানি ইত্যাদি যেকোনো একটি পুষ্টি উপাদানের অভাবে গবাদিপশুর রোগ হলে তাকে অপুষ্টিজনিত রোগ বলা হয়। মানুষ ও গবাদিপশুর শরীরে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ খুবই কম পরিমাণে দরকার হয়। প্রধানত এ দুটি পুষ্টি উপাদানের অভাবে পশু অপুষ্টিজনিত রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। যেমন- দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, দৈহিক বৃদ্ধি না হওয়া, ত্বক অমসৃণ হওয়া, দেরিতে দাঁত ওঠা, হাড় বেঁকে যাওয়া, মিল্ক ফিভার ইত্যাদি।

ঘ। অন্যান্য সাধারণ রোগ : অন্যান্য সাধারণ রোগের মধ্যে পেট ফাঁপা, উদরাময় ও বদহজম উলেখযোগ্য। সাধারণত খাদ্যে অনিয়ম, পচা-বাসি খাদ্য ও `wIZ পানির কারণে এ ধরনের রোগ হয়ে থাকে। বাছুরকে খাদ্য সরবরাহের সময় এ বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

কাজ

শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গরুর রোগের বিভিন্ন কারণ লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

bZb kã cwiwPwZ : সংক্রামক রোগ, পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি।

পাঠ ১৮ : গরুর রোগ ব্যবস্থাপনা

গবাদিপশুর খামারে রোগ ব্যবস্থাপনা একটি ¸iZcY বিষয়। পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রোগ ব্যবস্থাপনা করা হয়। পশু খামারে রোগ না হওয়ার জন্য গৃহীত উপায়সমূহকে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। খামারে রোগ দেখা দেওয়ার পর চিকিৎসাসহ অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

পশুর রোগ প্রতিরোধের উপায়সমূহ : পশুর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থার বিকল্প নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি প্রবাদ n‡"Q "রোগব্যাধির চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়"। তাই পশু খামারের উৎপাদন চলমান রাখার জন্য পশুর রোগ প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় c`‡¶cmgn গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে পশু খামারে রোগ প্রতিরোধের Dcwqmgn বর্ণনা করা হলো।

১। গোয়াল ঘর ও এর চারপাশ নিয়মিত পরিষ্কার ও শুকনো রাখা।

২। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য বন্য পশুকে খামারে ঢুকতে না দেওয়া।

৩। খামারে সাধারণ মানুষের প্রবেশ বন্ধ করা।

৪। পশুকে নিয়মিত টিকা দেওয়া।

৫। পশুকে সময়মতো কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো।

৬। পশুকে সুষম খাবার সরবরাহ করতে হবে।

৭। খাদ্যের পাত্র ও পানির পাত্র প্রতিদিন পরিষ্কার করা।

৮। পশুকে তাজা খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা।

৯। সম্ভব হলে বিভিন্ন বয়সের গরুকে আলাদা রাখা।

১০। পশুকে অতি গরম ও ঠাণ্ডা হতে রক্ষার ব্যবস্থা করা।

KvR
শিক্ষক ভিডিওর মাধ্যমে পশু খামারে রোগ প্রতিরোধের Dcvqmgn †দখাবেন এবং এখান থেকে বাড়ির কাজ দেবেন।

গবাদিপশুর রোগ হলে করণীয় : পশুতে রোগ দেখা দিলে আতঙ্কিত না হয়ে রোগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সময় নিম্নে বর্ণিত welqmgn অনুসরণ করতে হবে।

১। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে অসুস্থ পশুকে সুস্থ পশুর দল থেকে আলাদা করা।

২। অসুস্থ পশুকে চিকিৎসা প্রদান করা।

৩। অসুস্থ পশুকে আলাদা ঘরে পর্যবেক্ষণ করা।

৪। প্রয়োজনে অসুস্থ পশুর রক্ত ও মলমূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫। রোগাক্রান্ত পশুকে বাজারজাত না করা।

মৃত পশুর সৎকার : মৃত পশুকে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা যাবে না। মৃত পশু পরিবেশ `wlZ করে। পশুর রোগ জীবাণু বাতাসে ছড়ায় এবং সুস্থ পশুকে আক্রান্ত করে। তাই মৃত্যুর পর অতি দ্রুত পশুর সৎকারের ব্যবস্থা করতে হবে। খামার ও বসতবাড়ি হতে `‡i মৃত পশুকে সৎকার করতে হবে। মৃত পশুকে উঁচু স্থানে মাটির ১.২ মিটার (৪ ফুট) গভীরে গর্ত করে মাটিচাপা দিতে হবে। মাটিচাপা দেওয়ার সময় গর্তের ওপরের ¯—‡i চুন বা ডিডিটি ছড়িয়ে দিতে হবে। মৃত পশুকে স্থানান্তরের সময় মলমুত্রে যেন যেখানে-সেখানে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

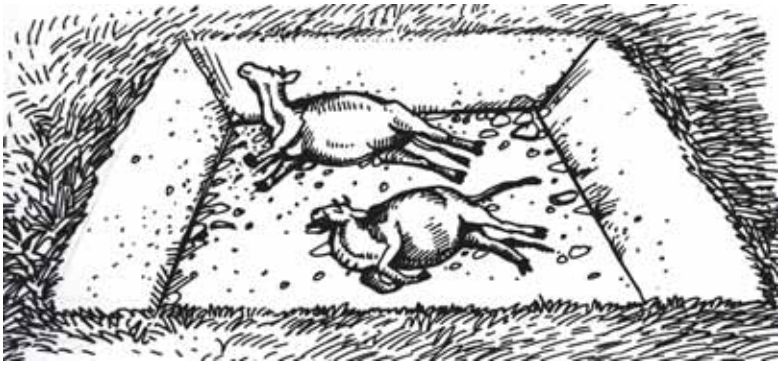

চিত্র : মৃত পশু গর্তে ফেলা হচ্ছে

কাজ
"শিক্ষার্থীরা দলে ভাগ হয়ে গরুর রোগ প্রতিরোধের সহায়ক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়" সে নীরিখে দলগত কাজ করে শ্রেণিতে জমা দেবে।

bZb kã cwiwPZ : সংক্রামক রোগ, পাতা কৃমি, ফিতা কৃমি ও গোল কৃমি।

পাঠ ১৯ : ডিম সংগ্রহ ও বাছাই

ডিম একটি ভঙ্গুর ও পচনশীল দ্রব্য। বাড়িতে বা খামারে দু'ধরনের ডিম উৎপাদন করা হয়। e\"P\ ফুটানোর জন্য যে ডিম উৎপাদন করা হয় তাকে বীজ ডিম এবং খাবার জন্য যে ডিম উৎপাদন করা হয় তাকে খাবার ডিম বলা হয়। বীজ ডিম উৎপাদনের জন্য মোরগের দরকার হয় কিন্তু খাবার ডিম উৎপাদনের জন্য মোরগের দরকার হয় না।

ডিম সংগ্রহ : ডিম পাড়ার পর দ্রুত সংগ্রহ, বাছাই ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খাঁচায় ডিম পাড়া মুরগি নিজের ডিম নষ্ট করতে পারে না এবং ডিমগুলো পরিষ্কার-cwi"Qb থাকে। অন্যদিকে মেঝেতে বা লিটারে পালনকারী অনেক মুরগি বাসায় ডিম না পেড়ে লিটারে পাড়ে। অনেক সময় এটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। লিটারে পাড়া ডিমে ময়লা লেগে যায় এবং পরিষ্কার করতে অসুবিধা হয়। তা ছাড়া লিটারে ডিম পাড়ার সময় পাতলা খোসার ডিম অনেক সময় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। লিটারে ডিম পাড়ার আরেকটা সমস্যা n‡"Q মুরগির ডিম খাওয়া। এটি একবার সৃষ্টি হলে তা বদঅভ্যাসে রূপ নেয়। মুরগির ডিম দিনে ২ বার সংগ্রহ করতে হবে। দুপুর ১২-০০ ঘটিকা ও বিকাল ৪-০০ ঘটিকায় ডিম সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু হাঁসের ডিম মাত্র একবার সংগ্রহ করা হয়। কারণ হাঁস সকাল ৯-০০ ঘটিকার মধ্যে ডিম পাড়ে।

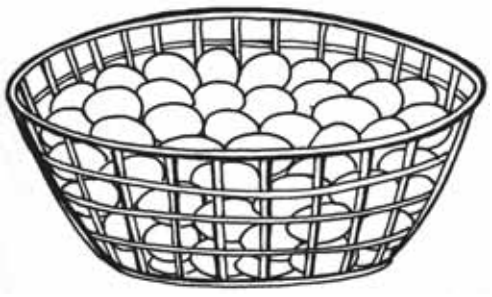

চিত্র : ঝুড়িতে সংগ্রহ করা ডিম

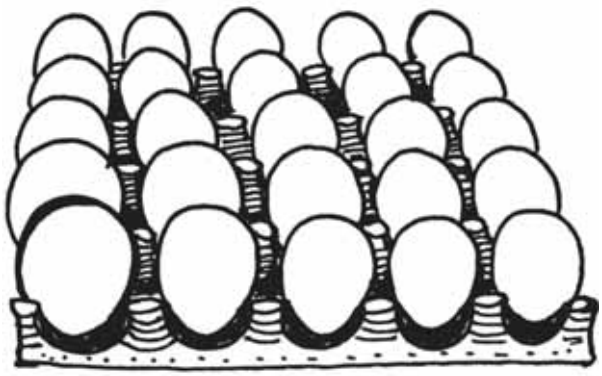

চিত্র : ট্রেতে বাছাই করা ডিম

ডিম বাছাই : ডিম সংগ্রহ করার পর তা বাছাই করা হয়। বীজ ডিমের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ডিম যেমন অতিবড়, অতিছোট, গোলাকৃতি ও লম্বা আকারের ডিম বাদ দিতে হবে। তা ছাড়া অধিক ময়লাযুক্ত ডিম, ফাটা ও পাতলা খোসার ডিম ফুটানোর জন্য নির্বাচন করা হয় না। কোনো খাবার ডিম বেশি ময়লাযুক্ত হলে পানি দিয়ে ধোয়া যায়। খাবার ডিম বা বীজ ডিম বাছাই করার পর প্লাস্টিক ট্রেতে সাজাতে হবে। ট্রেতে ডিম বসানোর সময় ডিমের মোটা অংশ ওপরের দিকে ও সরু অংশ নিচের দিকে দিতে হবে। এরপর ট্রে-সহ ডিমকে ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করা হয়। বীজ ডিম দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ৫০-৫৫° (১০-১২° সে.) ফারেনহাইট তাপমাত্রায় অর্থাৎ ঠান্ডা স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। খাবার ডিম মাটির হাঁড়িতে বা ডিমে তেল মাখিয়ে অনেক দিন রাখা যায়। কিন্তু বীজ ডিম গরমকালে ৩-৫ দিন ও শীতকালে ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়।

কাজ

শিক্ষক ডিম সংগ্রহ ও বাছাইয়ের ওপর ভিডিও দেখাবেন। এরপর শিক্ষার্থীদের ভালো ডিমের বৈশিষ্ট্য লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করতে বলবেন।

বাছাইয়ের সময় গ্রেডিং করা : আমাদের দেশে হালি বা ডজন হিসাবে ডিম বিক্রি হয়। বাজারে ওজন হিসাবে ডিম বিক্রি হয় না। বড় ডিমে বেশি পুষ্টি পাওয়া যায়। তাই ওজন অনুসারেই ডিম বিক্রি হওয়া উচিত। ডিম বাছাইয়ের সময় আকারে বা ওজন অনুসারে ডিমকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ডিমের গ্রেডিং তালিকা (মুরগি)

ক্রমিক নং	আকার	একটি ডিমের ওজন (গ্রাম)
১	অতি বড়	৬০ গ্রামের অধিক
২	বড়	৫৩-৫৯ গ্রাম
৩	মাঝারি	৪৬-৫২ গ্রাম
৪	ছোট	৩৮-৪৪ গ্রাম

bZb kã cwiwPwZ : বীজ ডিম, খাবার ডিম, লিটার।

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. গম ..... ফসল।

২. বাংলাদেশে দ্রুত ..... জমি কমে h\‡"Q|

৩. মাছের জীবনধারণের ..... n‡"Q পানি।

৪. মিশ্র চাষে মাছের ..... বৃদ্ধি পায়।

বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

বামপাশ	ডানপাশ
১. ইঁদুর গমের একটি	খোলামেলা হবে
২. পুষ্টিমান বিচারে মাশরুম	প্রধান শত্রু
৩. মিশ্রচাষের জন্য পুকুর	দুর্বল থাকে
৪. খোলস বদলের সময় চিংড়ি	সবার সেরা ফসল খাদ্য গ্রহণ করে

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাভির প্রধান খাদ্য কোনটি?

ক. খড় খ. কাঁচাঘাস

গ. দানাদার খাদ্য ঘ. লতা-পাতা

২. মাশরুমের চাষঘরে পানি †¯ú করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়-

i. আর্দ্রতা

ii. তাপমাত্রা

ii. কার্বন ডাই-অক্সাইড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩. ফল সংগ্রহ করার পরই শর্করা থেকে চিনি তৈরি বন্ধ হয়ে যায় কোন ফল ¸‡"Q?

ক. কলা, লেবু, লিচু　　খ. বেল, কলা, আঙুর

গ. পেঁপে, আঙুর, জাম্বুরা　　ঘ. আঙুর, লিচু, লেবু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

হাফিজ সাহেব বাড়ির সামনের ৪০ শতক আয়তনের ১ মিটার গভীরতার ১টি পুকুরে কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ করেন। কিন্তু তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও পুকুর থেকে K¬•¶Z উৎপাদন পাননি।

৪. হাফিজ সাহেব তাঁর পুকুরে কমপক্ষে ৭-১০ সে. মি. আকারের কতটি পোনা ছাড়তে পারবেন?

ক. ২০০০　　খ. ২১০০

গ. ২২০০　　ঘ. ২৩০০

৫. হাফিজ সাহেবের পুকুর থেকে কাি‥ত উৎপাদন না পাওয়ার কারণ-

i. প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হওয়া

ii. পানির গুণাগুণ যথাযথ না থাকা

iii. পুকুরের আয়তন বেশি হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii

গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৬. মাশরুম চাষের জন্য প্যাকেটজাত বীজকে কী বলা হয়?

ক. ¯úb　　খ. ¯úU

গ. মিল্কি　　ঘ. বাটন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

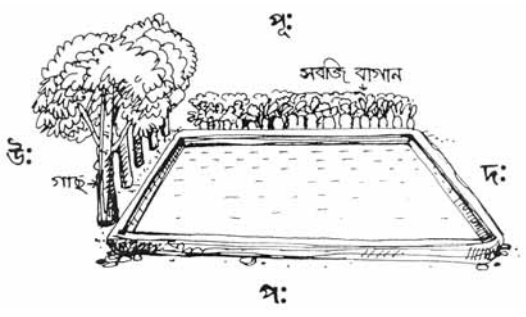

চিত্র : ক

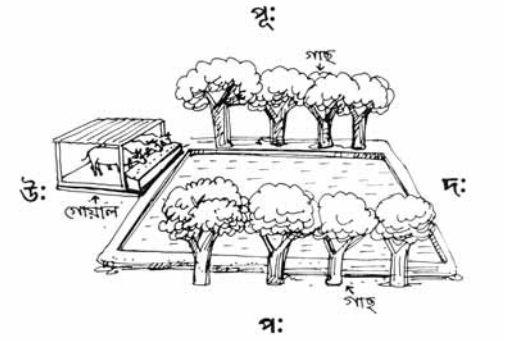

চিত্র : খ

ক. মিশ্র চাষ কাকে বলে?

খ. মাছের মিশ্র চাষের একটি সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রের কোন পুকুরটি মিশ্র চাষের জন্য উপযোগী, কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. চিত্রের পুকুর ২টি মাছ চাষে সমানভাবে লাভজনক কি না। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. অমল যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৫টি সংকর জাতের গাভি দিয়ে একটি খামার গড়ে তোলেন। তিনি গাভিগুলোর যত্ন ও পরিচর্যা করার পরও প্রতিটি গাভি থেকে আশানুরূপ দুধ cw"Q‡jb না। এ অবস্থায় প্রাণী কর্মকর্তার পরামর্শ মতে স্বাস্থ্যসম্মত পালন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রতিটি গাভি ১২ লিটার করে দুধ দেয়। বর্তমানে তিনি একজন সফল খামার মালিক।

ক. গরু কোন জাতের খাদ্য বেশি পরিমাণ খায়?

খ. গোয়ালঘর উঁচু স্থানে করা প্রয়োজন কেন, ব্যাখ্যা কর।

গ. অমলের খামারের ১টি গাভির জন্য দৈনিক কী পরিমাণ দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন তা নির্ণয় কর।

ঘ. অমল কী ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তাঁর গাভিগুলোর দুধ উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়। তা বিশেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মাশরুম কী?

২. উদ্যান ফসলকে কয়ভাবে তোলা হয় ও কী কী?

৩. মাছের মিশ্র চাষ কাকে বলে?

৪. প্লাঙ্কটন কী?

রচনামলক প্রশ্ন

১. গলদা চিংড়ি চাষের জন্য পুকুর তৈরির ধাপগুলো লেখ।

২. পশুর সঠিক পরিচর্যার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনা করা হয়। তা বর্ণনা কর।

৩. গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা কর।

৪. কীভাবে ডিম সংগ্রহ ও বাছাই করা হয় তা লেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বনায়ন

কৃষি বনায়ন একটি অতি প্রাচীন ও সনাতন পদ্ধতি। mv¤úwZK কালে বনায়নের এ পদ্ধতি কৃষিবিজ্ঞান ও কৃষি প্রযুক্তি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। কৃষি বনায়ন হলো কৃষিজ ও বনজ বৃক্ষের সম্মিলিত চাষাবাদ পদ্ধতি, যাতে একজন কৃষক ভূমির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন করতে পারেন। এ বনায়ন পদ্ধতি পরিবেশবান্ধবও বটে। সারা দেশে পরিকল্পিত উপায়ে বনজ m¤ú` বৃদ্ধি করা খুবই জরুরি। এ জন্য কৃষি ও সামাজিক বনায়ন m¤ú‡K আমাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। এ বনায়নের গুরুত্বও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সরাসরি এসব বনায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে দেশের বনজ m¤ú` বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবেশ বাস উপযোগী রাখতে হবে। এ অধ্যায়ে তোমরা নার্সারি তৈরির কৌশল ও এর অবদান m¤ú‡K জানবে ও দক্ষতা অর্জন করবে। এ ছাড়া কৃষি ও সামাজিক বনায়নের গুরুত্ব, সমস্যা এবং সমাধানের উপায় নির্ধারণ করতে পারবে। সামাজিক কৃষি বনায়নের নকশা তৈরি করতে পারবে। সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষ রোপণ করতে পারবে।

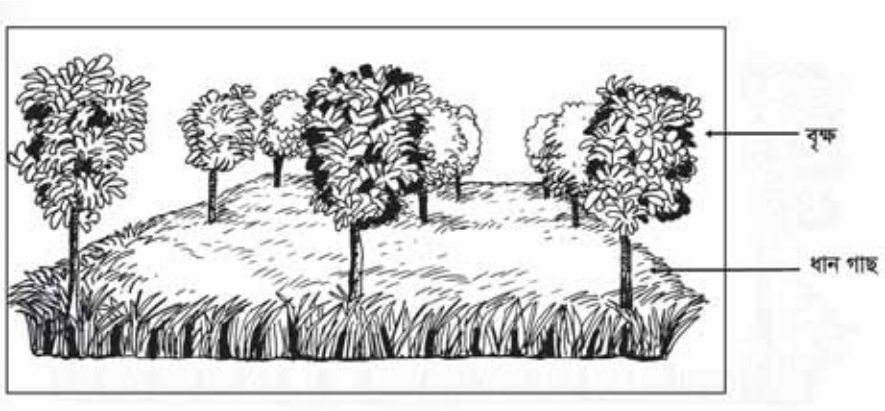

চিত্র : কৃষিজমিতে সারিবন্ধ কৃষি বনায়নের নমুনা

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

১। কৃষিক্ষেত্রে নার্সারি তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

২। কৃষিক্ষেত্রে নার্সারির অবদান উপলব্ধি করতে পারব।

৩। পলিব্যাগে চারা তৈরি করতে পারব।

৪। কৃষি বনায়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

৫। কৃষি বনায়নের mgm¨vmgn সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

৬। সামাজিক ও কৃষি বনায়নের নকশা বর্ণনা করতে পারব।

৭। সামাজিক ও কৃষি বনায়নের নকশা c¯‘Z করতে পারব।

৮। মিশ্রবৃক্ষ রোপণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৯। সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১ : নার্সারি এবং কৃষিক্ষেত্রে নার্সারি

নার্সারি হলো চারা উৎপাদন কেন্দ্র যেখানে চারা উৎপাদন করে রোপণের পূর্ব পর্যন্ত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। নার্সারি m¤ú‡K তোমাদের ev¯Íe অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন দরকার। এ জন্য সুবিধামতো সময়ে শিক্ষকের সাথে নার্সারি পরিদর্শন কর। শ্রেণিতে নার্সারির ভিডিও চিত্র দেখ। সম্ভব না হলে চার্টে নার্সারির চিত্র পর্যবেক্ষণ কর। নার্সারি m¤ú‡K শিক্ষক যেসব প্রশ্ন করেন তার উত্তর দাও।

চিত্র : স্থায়ী নার্সারি

আমাদের অধিক জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে বনজ m¤ú` ধ্বংসের মুখোমুখি। এর ফলে আমাদের পরিবেশ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৃক্ষ সংরক্ষণ ও বনায়ন করা দরকার। আর যেকোনো বনায়নে প্রয়োজন সবল চারা। এ জন্য আমাদের নার্সারির ওপর নির্ভর করতে হয়।

নার্সারির প্রকারভেদ

১। স্থায়িত্বের ওপর ভিত্তি করে নার্সারি দু ধরনের হয়, যথা-

(ক) স্থায়ী নার্সারি, (খ) অস্থায়ী নার্সারি

(ক) স্থায়ী নার্সারি : এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর সব সময় চারা উত্তোলন করা হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকে। আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি উভয় ব্যবস্থায় স্থায়ী নার্সারি রয়েছে। এখান থেকে উন্নত মানের চারা সরবরাহ করা হয়।

(খ) অস্থায়ী নার্সারি : সড়ক ও জনপথ বিভাগ নতুন iv¯Ív নির্মাণের পর iv¯Ívi দুপাশে গাছ লাগায়। এ জন্য অস্থায়ী নার্সারি স্থাপন করে। যেখানে এ রকম বাগান তৈরি করা হয় বা ব্যাপক হারে বনায়ন করা হয়, সেখানে অস্থায়ী ভিত্তিতে নার্সারি স্থাপন করা হয়। এতে চারা পরিবহনে খরচ কম হয়। সতেজ চারা সহজে পাওয়া যায়।

২। মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে নার্সারিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়-

(ক) পলিব্যাগ নার্সারি : এ ক্ষেত্রে চারা পলিব্যাগে তৈরি ও পরিচর্যা করা হয়। পলিব্যাগ সহজে নিরাপদ জায়গায় নেওয়া যায়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে চারা রক্ষা করা যায়।

(খ) বেড নার্সারি : এ ক্ষেত্রে সরাসরি মাটিতে বেড করে চারা উত্তোলন করা হয়। অনেক সময় বেডে উৎপাদিত চারা উত্তোলন করে পলিব্যাগে স্থানান্তর করা হয়। এছাড়া রয়েছে- গার্হস্থ্য নার্সারি, প্রজাতিভিত্তিক নার্সারি ও ব্যবহারভিত্তিক নার্সারি।

কাজ-১ : নার্সারির m¤úKxq নিচের ম্যাপ দুটি পোস্টার পেপারে দলগতভাবে m¤úb কর।

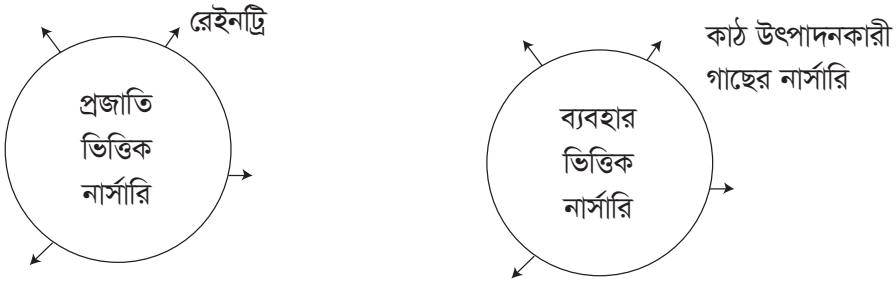

কৃষিক্ষেত্রে নার্সারির প্রয়োজন

১. রোপণের জন্য সব সময় নার্সারিতে সুস্থ, সবল ও সব বয়সের চারা পাওয়া যায়।

২. নার্সারিতে সহজে চারার যত্ন নেওয়া যায়।

৩. গর্জন, শাল, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গাছ থেকে ঝরার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপণ করতে হয়। এসব উদ্ভিদের চারা তৈরির জন্য নার্সারিই উত্তম স্থান।

৪. কাঁঠাল, P¤úv প্রভৃতি গাছের বীজ ফল থেকে বের করার পরই রোপণ না করলে অঙ্কুরোদগমের হার কমে যায়। এসব গাছের চারা তৈরির জন্য নার্সারির প্রয়োজন।

৫. অল্প শ্রমে ও কম খরচে চারা তৈরির জন্য নার্সারি উপযুক্ত স্থান।

৬. চারা বিতরণ ও বিপণন করতে সুবিধা হয়।

কাজ-২ : দলীয় আলোচনার মাধ্যমে নার্সারির গুরুত্বmg‡ni তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ২ : নার্সারি তৈরির কৌশল

নার্সারি তৈরি করতে হলে প্রথমেই যা দরকার তাহলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা নির্দিষ্ট কিছু নীতি ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে করতে হয়। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:

১. স্থান নির্বাচন
২. নার্সারি জায়গার পরিমাণ নির্ণয়
৩. বেড়া নির্মাণ
৪. ভূমি উন্নয়ন
৫. অফিস ও বাসস্থান
৬. বিদ্যুতায়ন
৭. i¨vÍv ও পথ
৮. সেচ ব্যবস্থা
৯. নর্দমা ও পার্শ্বনালা
১০. নার্সারি বক
১১. নার্সারি বেড
১২. পরিদর্শন পথ

নার্সারির স্থান নির্বাচন

নির্বাচিত জমি উর্বর ও দোআঁশ মাটিm¤úb হতে হবে। অপেক্ষাকৃত উঁচু, সমতল ও আলো বাতাস m¤úY হতে হবে। পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে। মালামাল ও চারা পরিবহনে উন্নত ব্যবস্থা থাকবে।

নার্সারির জায়গার স্থান নির্ণয়

এক বর্গমিটার (১০.৭৫ বর্গফুট) শিট বেড বা পট বেডে নিম্নলিখিত সংখ্যক চারার সংস্থান হবে।

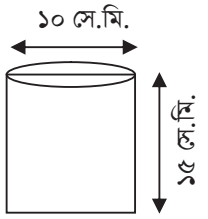

চিত্র : পলিব্যাগ

পলিব্যাগের সাইজ	প্রতি বর্গমিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি.	৬৫টি
১৮ সে.মি. × ১২ সে.মি.	৪৫টি
২৫ সে.মি. × ১৫ সে.মি.	২৬টি

সিট বেডে চারা হতে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গমিটারে (১০.৭৫ বর্গফুটে) চারার সংখ্যা
৫ × ১০ সে.মি.	৪০০টি
১০ × ১২ সে.মি.	২০০টি
১০ × ১০ সে.মি.	১০০টি

নার্সারি বক, বেড ও পরিদর্শন পথ

যেখানে চারা উত্তোলন করা হবে নার্সারির সে অংশকে কয়েকটি বকে ভাগ কর। প্রত্যেক বকে ১০-১২টি ce পশ্চিম দিকে লম্বালম্বি বেড রাখো। দুই বেডের মধ্যে ২৫ সে.মি. `iZ রাখো। বিভিন্ন বকের মধ্যে সুবিধামতো পরিদর্শন পথ ও পার্শ্বপরিদর্শন পথ রাখ। প্রধান পরিদর্শন পথ ২-৩ মি. এবং পার্শ্বপরিদর্শন পথ ১-২ মি. প্রস্থ হবে। নার্সারিতে প্রধান পরিদর্শন পথ দিয়ে যাতে সহজে গাড়ি চলাচল করতে পারে এমনভাবে তৈরি করতে হবে। পার্শ্বপরিদর্শন পথে যাতে সহজে চারা পরিবহন ট্রলি চলাচল করতে পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

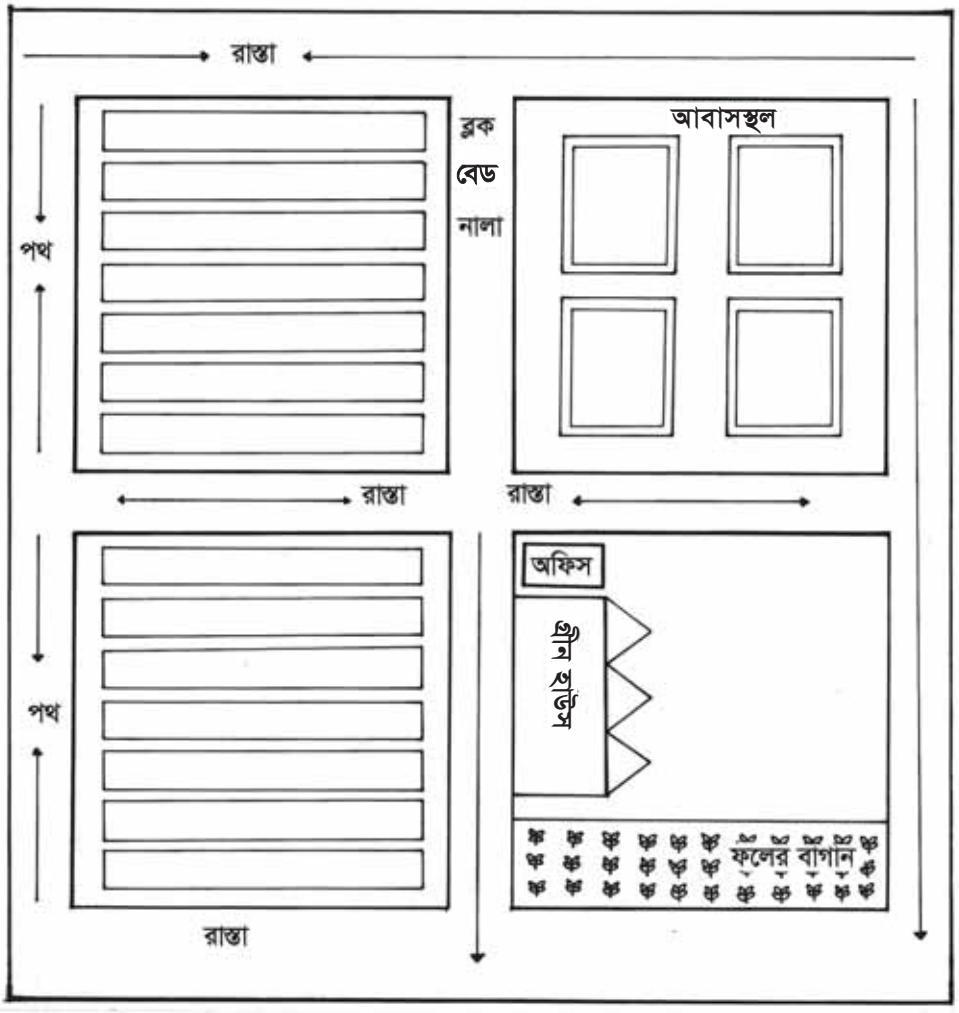

চিত্র : নার্সারির পরিকল্পনা (নমুনা)

কাজ-১ : একটি স্থায়ী নার্সারি পরিকল্পনা পোস্টার পেপারে আঁক এবং উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ ৩ : পলিব্যাগে চারা তৈরি করা

হাতে-কলমে পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা তৈরির জন্য শ্রেণি সংগঠন ও নির্দেশাবলি

১. সুবিধামতো দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দলের দলনেতা নির্বাচন কর।

২. প্রত্যেক দলের দলনেতা পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ বুঝে নাও।

৩. প্রত্যেক দল কাজের ধাপ অনুসরণ করে পলিব্যাগ তৈরি কর।

৪. এবার পলিব্যাগে বীজবপন করে পর্যবেক্ষণ কর।

৫. পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত দলীয় প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ শিক্ষকের কাছে জেনে নাও।

৬. পাঠের এ অংশ মাঠে m¤úb কর।

বিষয় : পলিব্যাগে বীজ বপন ও চারা তৈরি।

উপকরণ : বীজ, দোআঁশ মাটি, গোবর, K‡¤úvw÷, ১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগ, পানি দেওয়ার ঝাঁঝর।

কাজের ধাপ :

১. মাটি ভেঙে গুঁড়া করে নাও।

২. ৪ ভাগের ৩ ভাগ মাটি ও ১ ভাগ গোবর বা K‡¤úvw÷ সার ভালো করে মেশাও।

৩. পলিব্যাগের তলাসহ দুই সারিতে ৮টি ছিদ্র কর।

৪. পলিব্যাগে ভালো করে মাটি ভর্তি কর।

৫. ছায়াযুক্ত সমতল জায়গায় সারিবদ্ধভাবে পলিব্যাগগুলো সাজাও।

৬. মাটিভর্তি পলিব্যাগের ওপরে আঙুল দিয়ে দুটি গর্ত করো। প্রতিটি গর্তে একটি করে বীজ দাও।

৭. গুঁড়ামাটি দিয়ে বীজ ভালো করে ঢেকে দাও। ঝাঁঝর দিয়ে হালকাভাবে পানি ছিটিয়ে দাও।

৮. বীজ বপনের তারিখ খাতায় লিখে রাখ।

৯. প্রতিদিন সকাল-বিকাল ঝাঁঝর দিয়ে পরিমিত পরিমাণ পানি দাও।

১০. অঙ্কুরোদগম শুরুর তারিখ খাতায় লিখে রাখ।

১১. চারা ১৫ সে.মি. হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ কর।

১২. পরীক্ষার সব তথ্য খাতায় লিখে রাখ। প্রতিবেদন তৈরি করে দলীয়ভাবে শিক্ষককে জমা দাও।

পলিব্যাগে চারা তৈরী সংক্রান্ত চিত্র

চিত্র : পলিব্যাগের জন্য মাটির গুঁড়া চালনি দিয়ে চেলে নেওয়া

চিত্র : পলিব্যাগে মাটিভর্তি

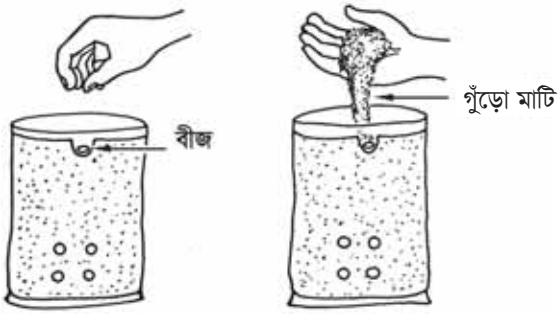

চিত্র : পলিব্যাগে বীজ রোপণ

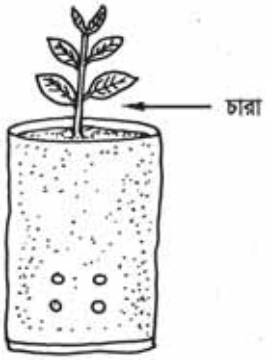

চিত্র : পলিব্যাগে চারা রোপণ

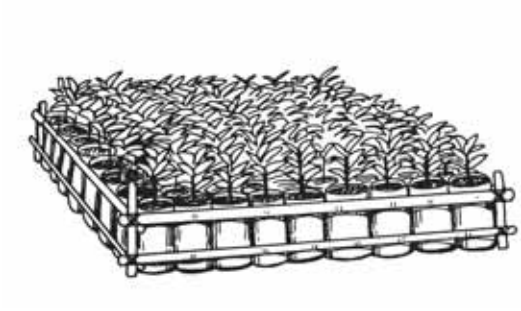

চিত্র : নার্সারি বেডে পলিব্যাগে সাজানো পদ্ধতি

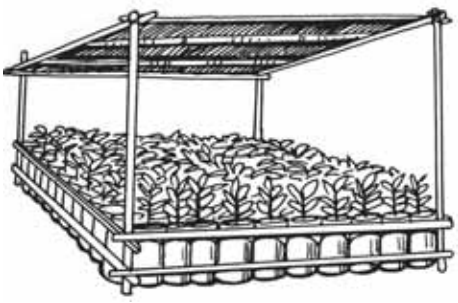

চিত্র : নার্সারি পলিব্যাগে বেডে বাঁশের ছাউনি

কাজ

পলিব্যাগে চারা তৈরিসংক্রান্ত চিত্রগুলো সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ কর। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহযোগিতা নাও।

পাঠ ৪ : কৃষি বনায়নের গুরুত্ব

কৃষি বনায়ন হলো এক ধরনের ভূমি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিতভাবে বনায়ন করা হয়। এ ধরনের বনায়নে একই জমিতে বৃক্ষ, ফসল, পশুখাদ্য ও মৎস্যখাদ্য উৎপাদন করা হয়। এ বনায়নে কোনো উপাদান অন্য উপাদানকে ব্যাহত করে না। সব উপাদান সমন্বিতভাবে পরিবেশ সমৃদ্ধ করে। অর্থনৈতিকভাবে এ বনায়ন লাভজনক হয়। এ বনায়নের ফলে ভূমির বহুমুখী ব্যবহার করা যায়।

কাজ

১। কৃষি বনায়ন ও এর গুরুত্ব (দলীয় কাজ)

ক. চিত্র পর্যবেক্ষণ করে বল এটিকে কেন কৃষি বনায়ন বলা হয়।

খ. দলীয়ভাবে আলোচনা করে বল কৃষি বনায়ন কেন গুরুত্বcY?

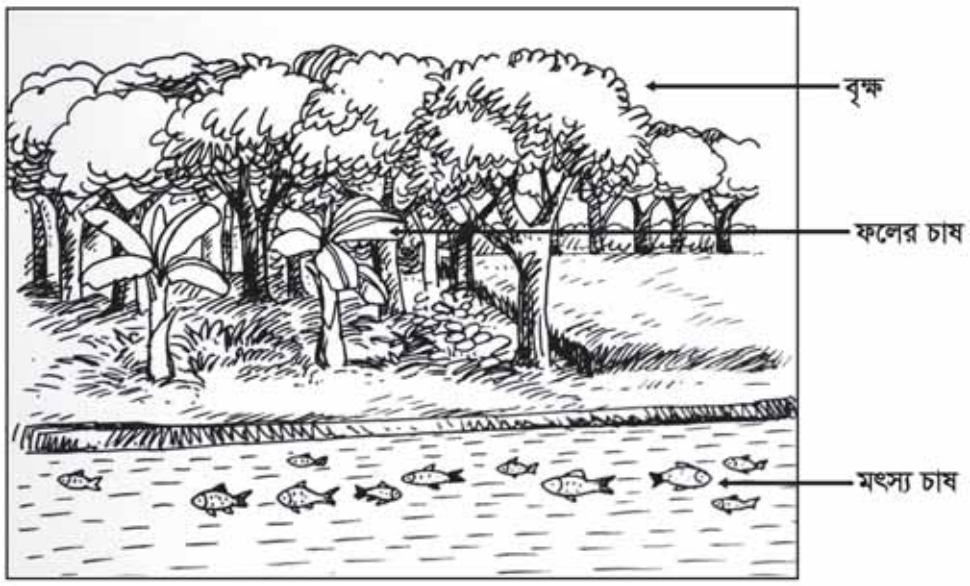

চিত্র : সমন্বিত মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল চাষের নমুনা

জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি গুরুতcÝ সমস্যা। আমাদের ভূমি সীমিত। বিশাল জন সংখ্যার চাহিদা মেটাতে এ ভূমি সক্ষম নয়। সুতরাং বৃক্ষায়ন শুধু বনভূমিতে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কৃষি বনায়নকে আধুনিক প্রযুক্তি হিসাবে গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি। তাই সাধারণ কৃষি খামার, iv¯Ív ও বাঁধের ধার, বাড়ির আঙিনা, প্রতিষ্ঠানের চারপাশ— সর্বত্র কৃষি বনায়ন জরুরি। এ জন্য সারাদেশে নিবিড় ও ব্যাপক কৃষি বনায়ন বিপব ঘটানো প্রয়োজন।

কৃষি বনায়ন আমাদের জীবনের বহুমুখী সমস্যা সমাধানে গুরুত্বcY ভূমিকা রাখতে পারে। এ m¤úK© তোমাদের তৈরি তালিকার সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখ ও আলোচনা কর।

কৃষি বনায়নের গুরুত্ব

১. খাদ্য চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে।

২. গৃহনির্মাণ ও আসবাবসামগ্রী তৈরিতে সাহায্য করে।

৩. জ্বালানি সমস্যা মেটায়।

৪. একই জমিতে বিভিন্ন রকম ফসল ও বৃক্ষ রোপণ করা যায়।

৫. অর্থ আয়ের ব্যবস্থা হয়, কর্মসংস্থান বাড়ে ফলে দারিদ্র, বিমোচন হয়।

৬. স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করা যায়।

৭. মাটিক্ষয় রোধ হয় ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

৮. পরিবেশ জীবের বসবাস উপযোগী হয়।

৯. প্রাকৃতিক `‡hv‡Mi হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১০. পশু-পাখির খাদ্য ও আবাসস্থল সৃষ্টি হয়।

১১. বৃষ্টিপাত বেশি হয়।

১২. মরুকরণ, বন্যা ও ভূমিধস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

মোট কথা, কৃষি বনায়ন গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, বৈপব্লিক পরিবর্তনের mPbv করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

পাঠ ৫ : কৃষি বনায়নের সমস্যা ও সমাধান

কৃষি বনায়ন হলো একটি ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি, এর ফলে-

১. একই জমিতে বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদের সাথে পশু-পাখির সমন্বিত চাষ হয়।

২. লতা জাতীয় ফসলকে একত্র করে মিশ্র চাষ করা হয়।

৩. কৃষি অথবা বনভিত্তিক একক ভূমি ব্যবহারের চেয়ে অধিকতর উৎপাদন ও উপকারিতা পাওয়া যায়।

কাজ-১ : কৃষি বনায়নের সমস্যা ও সমাধান

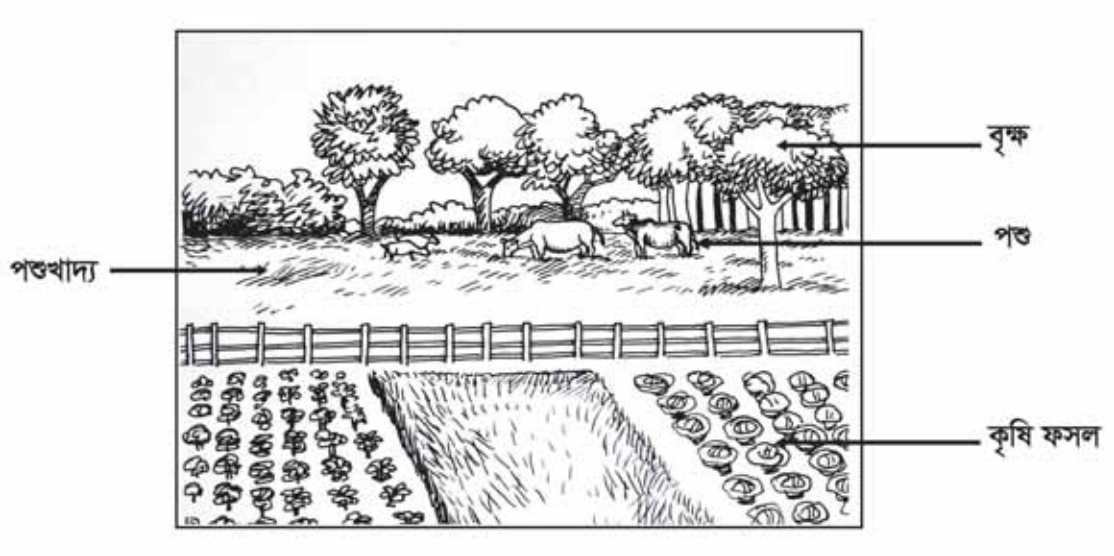

চিত্র : কৃষি বানয়ন

কৃষি বনায়নের সমস্যা

কৃষি বনায়ন mv¤úªwZK সময়ে বিশ্বব্যাপী একটি লাভজনক প্রযুক্তি হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। কিন্তু কৃষি বনায়নে যথেষ্ট সমস্যাও রয়েছে। এবার তোমরা কৃষি বনায়নের সমস্যা ও তা সমাধানের উপায় m¤ú‡K তোমাদের নিজেদের মতামতের তালিকার সাথে নিচের বিষয়গুলো মিলিয়ে দেখো।

১. কৃষি বনায়নের জন্য প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ কমছে।

২. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা কমে hv‡"Q|

৩. পোকা-মাকড় ও ক্ষতিকর জীব-জন্তুর আক্রমণে উৎপাদন কমছে।

৪. ভালো বীজ ও সারের অভাব।

৫. কৃষিবন রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা।

৬. শুকনো মৌসুমে পানি সেচের অভাব।

৭. উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণের অভাব।

৮. যাতায়াতে সুব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করা যায় না। ফলে উৎপাদিত পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। অল্প g‡j¨ কৃষককে বিক্রয় করতে হয়।

৯. কৃষি বন m¤ú‡K কৃষকের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব।

১০. কৃষিভিত্তিক শিল্পকারখানা না থাকা।

১১. এলাকাভিত্তিক কৃষিপণ্য সংরক্ষণের অভাব।

কৃষি বনায়নের সমস্যাসমূহের সমাধান

কৃষি আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যেসব জায়গায় সামাজিক বনায়ন করা হয় সেসব জায়গায় কৃষি বনায়নের আওতায় আনা দরকার। শস্য পর্যায় অনুসরণ করে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। যাতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। আলোর ফাঁদ, ফাঁদ যন্ত্র, নিম ও বিষ কাটালির নির্যাস ব্যবহার করে ক্ষতিকর জীব-জন্তু ও পোকা-মাকড় দমন করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে উৎপাদন ¶wZM¯Í হলে তা পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কৃষক যাতে উৎপাদিত পণ্যের সঠিক gj¨ পায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি বনায়ন m¤ú‡K কৃষককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নিতে হবে। ভালো বীজ ও সার সরকারিভাবে সরবরাহ করতে হবে। কৃষিবন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনগণের অংশীদারি বৃদ্ধি করতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। যাতে কৃষক সহজে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে সঠিক gj¨ পেতে পারে। এলাকাভিত্তিক কৃষি শিল্পকারখানা তৈরি করতে হবে যাতে করে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া কৃষিপণ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংরক্ষণের জন্য যথেষ্টসংখ্যক হিমাগারের ব্যবস্থাও সরকারি এবং বেসরকারিভাবে করা প্রয়োজন।

কৃষি বনায়নের চিত্র ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ কর। নিজের মতো করে কৃষি বনায়ন m¤ú‡K বল। e¨v¯Í‡e তোমরা কৃষি বনায়ন দেখেছ কি? দেখে থাকলে এ নবায়নের বৈশিষ্ট্য বল। কৃষি বনায়ন কেন লাভজনক? আমাদের দেশে কৃষি বনায়নের বাধা বা mgm¨wmgn কী কী তার তালিকা তৈরি কর। দলগত আলোচনার মাধ্যমে এসব সমস্যা `i করার উপায়গুলো বের কর।

পাঠ ৬ : সামাজিক বনায়নের নকশা বর্ণনা

সামাজিক বন

উদ্ভিদ-বান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য মানুষ পরিকল্পনা করে নিজস্ব চেষ্টায় এ বন তৈরি করে। বসতবাড়ি, প্রতিষ্ঠান, বাঁধ ও সড়ক, উপকূলীয় AÂj, পাহাড়ি পতিত জমিতে সামাজিক বন সৃষ্টি করা হয়।

সড়ক ও বাঁধে সামাজিক বনায়ন নকশা

বাংলাদেশে সচরাচর সড়ক ও বাঁধে গাছ রোপণের জন্য একসারি ও দ্বি-সারি নকশা অবলম্বন করা হয়।

একসারি নকশা

iv¯Ív সরু হলে এ নকশা অনুসরণ করে গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর সময় একই ধরনের `iZ অনুসরণ করা হয়।

দ্বি-সারি নকশা (ck¯Í বাঁধের জন্য)

১. বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. `‡i ঘন করে, অড়হরের বীজ বপন করতে হয়।

২. অড়হর সারির ১৮০ সে.মি. `‡i সুদৃশ্য গাছ লাগাতে হয়।

৩. সুদৃশ্য গাছের সারিতে গাছ থেকে গাছের `iZ ২ মিটার হবে।

৪. সুদৃশ্য গাছের সারি থেকে ১৮০ সে.মি. `‡i কাঠের গাছের সারি রোপণ করতে হয়।

৫. কাঠের গাছের সারিতে গাছ থেকে গাছের `iZ হবে ৬ মিটার।

৬. কাঠের গাছের সারির ৩০ সে.মি. `‡i ঘন করে ৈaÂvi বীজ বুনতে হবে।

সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ

বৃক্ষরোপণ কৌশল : এখানে গাছ লাগানোর স্থান অপর্যাপ্ত। তাই সরু লাইন করে গাছ লাগানো হয়। পাহাড়ি AÂ‡j বনায়নের সময় সাধারণত ২ মিটার × ২ মিটার `‡i `‡i গাছ লাগানো হয়।

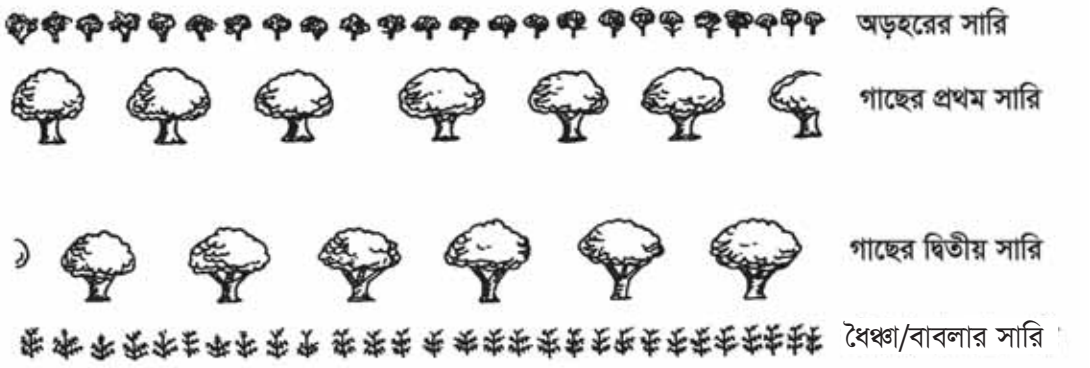

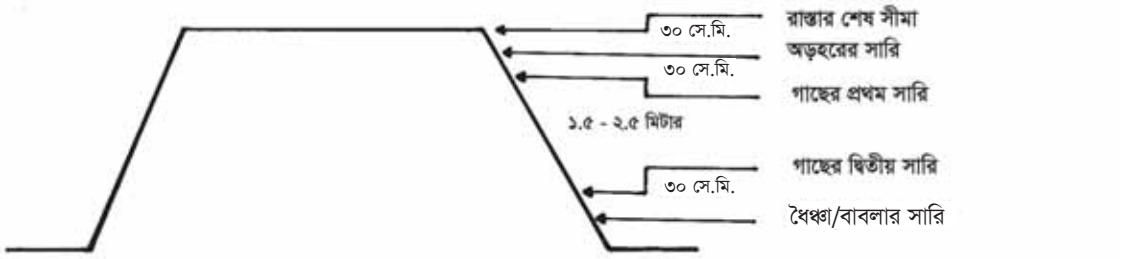

সড়ক ও বাঁধের ধারে দু'সারিতে বৃক্ষরোপণের সম্মুখ নকশা (খাড়া অবস্থায়)

সড়ক ও চিত্র : সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ

গাছ নির্বাচনে বিবেচ্য কৌশলসমহ

যেসব গাছের পাতা ছোট ও চিকন সেরকম গাছ লাগাতে হবে। i¯Ívi ধারে eû¯Íix বনায়ন করা ভালো। অর্থাৎ গাছের নিচে বিরুৎ বা গুল্ম জাতীয়উদ্ভিদের সংমিশ্রণ দিয়ে বনায়ন করা দরকার। অন্যথায় মাঝারি বা ছোট আকৃতির গাছ নির্বাচন করতে হবে।

গাছ লাগানোর উপায়

১. যানবাহন ও জনগণের চলাচলের জন্য পাশে যে স্থান থাকে তাতে এক সারি গাছ লাগানো যেতে পারে। স্থানভেদে জমির প্রাপ্যতার ওপর নির্ভর করে একাধিক সারি গাছ লাগানো যেতে পারে। যদি দুইসারি লাগানো হয় তবে ১.৫-২.০ `‡i `‡i গাছ লাগানো যেতে পারে।

২. যদি ঢালু অংশে গাছ লাগানো হয় তবে তা প্রথম সারির একটি গাছ থেকে অন্য গাছের যা `iZ তার সমান হলেও দুটো গাছের মধ্যবর্তী স্থান থেকে লাইন শুরু করা evÃbxq|

৩. সড়কের নিচের অংশে এক সারিতে গাছ লাগানো হয়। মাটির যে অংশ নিচে তাতে মান্দার, জারুল, হিজল প্রভৃতি গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর পদ্ধতি অন্যান্য গাছের মতো বাঁধের তীরে সামাজিক বনায়ন কৌশল।

গাছ নির্বাচন

১. বাঁধের দুপাশে দ্বি-বীজপত্রী উঁচু ও বেশি শাখা-প্রশাখাmg¤úb গাছ লাগানো উচিত নয়। কারণ বেশি উঁচু গাছ হলে মাটির ক্ষয় বেশি হয়।

২. বেশি এলাকাজুড়ে gj বা শিকড় থাকে এমন গাছ নির্বাচন করা উত্তম। যেমন— নারকেল, সুপারি প্রভৃতি এক বীজপত্রী গাছ। এদের শিকড় বেশি এলাকাজুড়ে থাকে বলে মাটির ক্ষয় রোধ হয়।

৩. বাঁধের পাশে গাছ লাগানোর সময় যেসব গাছের পাতা গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয়, সেসব গাছ নির্বাচন করা দরকার। কারণ বন্যার সময় এসব বাঁধ গৃহপালিত পশুর আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

বৃক্ষরোপণ কৌশল

১. চারা লাগানো ও যত্ন করার নিয়ম সব উদ্ভিদেরই এক রকম। ce শ্রেণিতে তোমরা এ mg¤ú‡K দক্ষতা অর্জন করেছ।

২. বাঁধের ধারে যেখানে গাছ লাগানো হয় তা ঢালু। সেখানে সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগাতে হয়।

৩. প্রথম লাইন যেখান থেকে শুরু হবে, দ্বিতীয় লাইন তার বরাবর না হয়ে মধ্যবর্তী স্থান থেকে শুরু হবে। ফলে দুই মিটার `‡i `‡i গাছ লাগানো হলেও প্রকৃতপক্ষে একটি চারা থেকে অন্য চারার `iZ হবে ২ মিটার × ১ মিটার। এর ফলে মাটিক্ষয় রোধ করার ক্ষমতা বাড়বে। এতে বাঁধ নষ্ট হয় না।

৪. গাছ সংরক্ষণের জন্য প্রতি এক মিটারে একজন পাহারাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য KgmwPi আওতায় গাছের অংশীদারি ও শ্রম দেওয়ার জন্য গম দেওয়া যায়।

পাঠ ৭ : কৃষি বনায়নের নকশা প্রস্তুত ও বর্ণনা

একই ভূমিতে সুবিবেচিতভাবে বৃক্ষ, ফসল ও পশুখাদ্য উৎপাদন পদ্ধতিই হলো কৃষি বনায়ন। এতে একে অন্যের উৎপাদনকে ব্যাহত করে না। পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়।

বাংলাদেশে সম্ভাব্য কৃষি বনায়নের যথেষ্ট উপযুক্ত স্থান রয়েছে। এগুলো হলো- বসত বাড়ির আঙিনা, কৃষিখামার, বসতবাড়ি সংলগ্ন জমি, পতিত ও প্রান্তিক জমি, ক্ষয়প্রাপ্ত ও নতুন করে সৃষ্ট ebwÂj, সড়ক, রেলপথ ও বাঁধসংলগ্ন এলাকা, পুকুর ও জলাশয়ের পাড়, উপকূলীয় AÂj ও উপযুক্ত স্থান।

সাধারণত সামাজিক কোনো নির্দিষ্ট এলাকার উপযুক্ত কৃষি বনায়ন মডেল বা নকশা তৈরিতে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয়, তা হলো-

১. ভূমির অবস্থান
২. সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা
৩. মাটির বৈশিষ্ট্য
৪. কৃষকের চাহিদা

সম্ভাবনাময় কয়েকটি কৃষি বনায়ন মডেল বা নকশার বর্ণনা

১. কৃষিভূমিতে ফসল ও বৃক্ষ চাষ : এ ধরনের নকশায় একই জমিতে কৃষি ফসলের সাথে যৌথভাবে বৃক্ষের চাষ করা হয়।

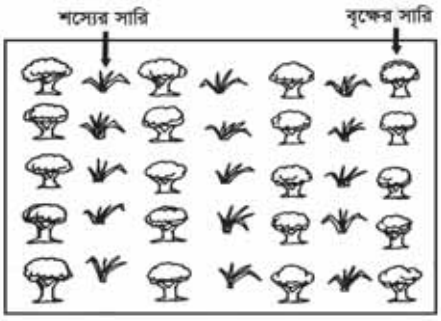

চিত্র : কৃষিজমিতে সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন

- সারিবদ্ধ কৃষি বনায়ন পদ্ধতি Zjbvgjkfv‡e নিচু জমিতে নির্ধারিত `i‡Z সারি করে গাছ লাগানো হয়। গাছের সারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি ফসলের চাষ করা হয়।

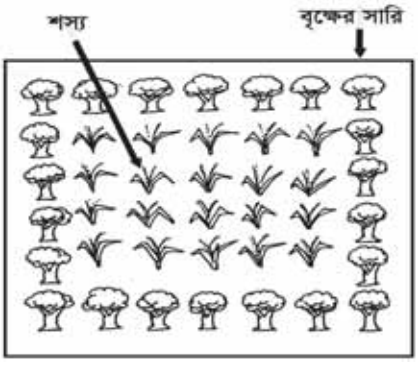

চিত্র : কৃষিজমির প্রান্তসীমায় বৃক্ষ চাষ

- কৃষি ফসলের প্রান্তসীমায় আইলের কাছে চারপাশে সারি করে গাছ লাগানো হয়।

- এ ধরনের মড্যুল বা নকশায় কৃষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষিজমিতে বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে চাষ করে থাকেন।

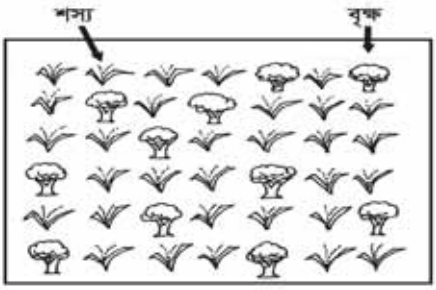

চিত্র : কৃষিজমিতে বিক্ষিপ্ত বৃক্ষ চাষ

২. অ্যালি ক্রপিং

কৃষি বনায়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি সফল পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে সাধারণত লিগিউম জাতীয় গুল্ম বা বৃক্ষ নির্দিষ্ট `i‡Z ঘন সারিবদ্ধভাবে লাগানো হয়। দুই সারির মাঝে কৃষিজ ফসলের চাষ করা হয়।

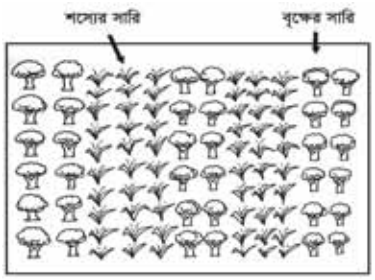

চিত্র : ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

৩. ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

এ পদ্ধতিতে বৃক্ষ ফলদ বা বনজ বৃক্ষের নিচে এক বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী কৃষি ফসল ও পশুপালন করা হয়।

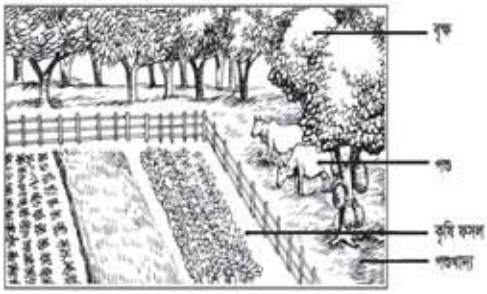

চিত্র : ফসল, বৃক্ষ ও পশুপালন

৪. মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল

এ পদ্ধতিতে মাছ চাষের সাথে সাথে পুকুরের ঢালু পাড়ে মাচার মাধ্যমে লতাজাতীয় শাক-সবজি লাগানো হয়। পানির প্রান্তসীমায় বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ এবং উঁচু পাড়ে ফলদ বৃক্ষ চাষ করা হয়।

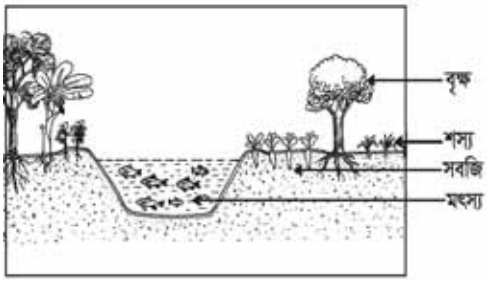

চিত্র : মৎস্য, বৃক্ষ ও ফসল

৫. বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

এ পদ্ধতিতে শাক-সবজি, খাদ্য, ফসল গবাদিপশু, হাঁসমুরগি এবং বিভিন্ন ধরনের বনজ ও ফলদ ও শোভাবর্ধনকারী গাছপালা একসাথে উৎপাদিত হয়।

চিত্র : বসতবাড়িতে কৃষি বনায়ন

কাজ :

তোমার এলাকায় কী ধরনের কৃষি বনায়ন করা সম্ভব দলীয়ভাবে তার একটি করে নকশা পোস্টার পেপারে আঁক এবং উপস্থাপন কর।

আঁক এবং উপস্থাপন কর।

পাঠ ৮ : মিশ্র বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা

মিশ্র বৃক্ষ চাষ

মিশ্র বৃক্ষ চাষ এক ধরনের বনায়ন ব্যবস্থা। বনায়নের এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের বৃক্ষের সমন্বিত চাষ হয়ে থাকে। মিশ্র বৃক্ষ চাষে একই জমিতে ফলদ, বনজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চাষ করা হয়। কখনো কখনো এসব বৃক্ষের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম ফসলি শস্যের চাষও হয়ে থাকে। অনেক সময় মিশ্র উদ্ভিদের সাথে পশুপাখি ও মৎস্য চাষও করা হয়। বাড়ির চারদিকে, খেলার মাঠের চারদিকে, বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, ফসলি জমি, নদী, খাল ও পুকুরপাড় প্রভৃতি স্থানে মিশ্র উদ্ভিদ চাষ করা সম্ভব।

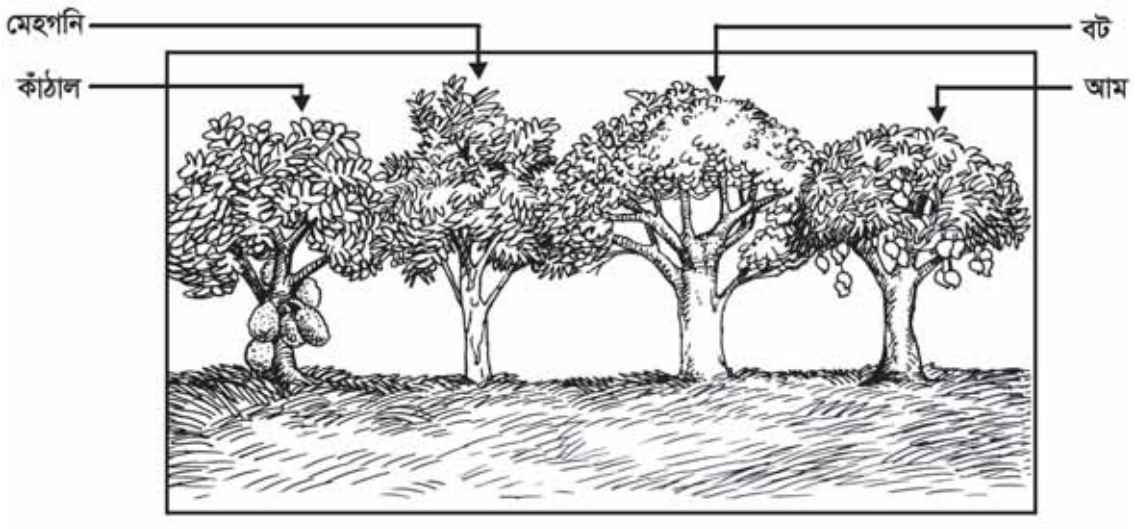

চিত্র : মিশ্র উদ্ভিদ চাষ

মিশ্র উদ্ভিদ চাষের এলাকা নির্বাচন

মাঝারি নিচু ও নিচু এলাকা

যেসব গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে সেসব গাছ নিচু এলাকায় লাগানো যেতে পারে। যেমন— হিজল, রয়না, জারুল, করছ, মান্দার, করই ইত্যাদি উদ্ভিদ নিচু এলাকায় রোপণ করা হয়। হাওর-বিল ও পার্শ্ববর্তী নিচু এলাকায় এসব উদ্ভিদ রোপণ করা হয়।

মাঝারি উঁচু ও উঁচু এলাকা

এসব এলাকা সব রকম গাছ লাগানোর জন্য উপযোগী। আম, কাঁঠাল, তাল, খেজুর, মেহগনি, শাল, সেগুন, বেল, কদবেল, আমলকী, বহেরা, হরীতকী প্রভৃতি উদ্ভিদের মিশ্র বৃক্ষ চাষ এসব এলাকায় হয়ে থাকে। বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি এলাকায় এসব উদ্ভিদের চাষ হয়ে থাকে। এলাকাভিত্তিক শিমুল, কার্পাস, আনারস, কমলা, কলা প্রভৃতি ফসলি উদ্ভিদ ও মিশ্র বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে চাষ করা হয়।

কাজ

১। মিশ্র বৃক্ষ চাষ m¤úK নিচের প্রশ্ন দুটির উত্তর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তৈরি ও উপস্থাপন কর।
ক. তোমাদের এলাকায় কী কী মিশ্র বৃক্ষ চাষ করা যায় পোস্টার পেপারে তার একটি তালিকা তৈরি কর।
খ. তোমাদের এলাকায় মিশ্র বৃক্ষ রোপণ না করে শুধু বনজ উদ্ভিদের চাষ করলে কী কী অসুবিধা হবে তা পয়েন্ট আকারে লেখ।

মিশ্র বৃক্ষ চাষের প্রয়োজনীয়তা

১. এলাকাভিত্তিক বৃক্ষরোপণের প্রজাতি নির্বাচন করা যায়।

২. এলাকায় বসবাসকারী জনগণের সব রকম চাহিদা মেটানো যায়।

৩. জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়।

৪. পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের আবাস সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের চাহিদা মেটে।

৫. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।

৬. গ্রামীণ জনসাধারণের কাজের ক্ষেত্র বাড়ে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে, ফলে দারিদ্র্য বিমোচন হয়।

৭. জ্বালানি, পুষ্টি, খাদ্য, e¯¿ ও বাসস্থানের প্রয়োজনে এ বন ভূমিকা রাখে।

৮. পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকে, বৃষ্টিপাত হয়।

৯. ভূমিক্ষয় ও ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

কাজ-২ : বাড়ি থেকে মিশ্র বৃক্ষরোপণ সংক্রান্ত নিচের ছক পূরণ করে আনবে।

খাদ্য উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	e¯¿ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	বাসস্থান নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	আসবাব তৈরির উপাদান উৎপাদনকারী উদ্ভিদ	ঔষধি উদ্ভিদ
১. ২.	১. ২.	১. ২.	১. ২.	১. ২.

পাঠ ৯ : সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণ পদ্ধতি বর্ণনা

সারিবদ্ধ বনায়ন

সড়ক ও বাঁধের ধারে কোথাও এক সারিতে, কোথাও দুই বা তিন সারিতে বনায়ন করা হয়ে থাকে। বৃক্ষরোপণের এ পদ্ধতিকে বলা হয় সারিবদ্ধ বনায়ন। সারিবদ্ধ বনায়ন বা স্ট্রিপ বনায়ন সামাজিক বনায়নের একটি উলেখযোগ্য উৎপাদন কৌশল। সারিবদ্ধ বনায়নে সাধারণত শিশু, আকাশমনি, অর্জুন, মেহগনি, জারুল, শিরীষ, রেইনট্রি, সোনালু, কৃষ্ণচূড়া, নীম প্রভৃতি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বন বিভাগ ছাড়াও বিভিন্ন এনজিও বিশ্বস্বাস্থ্য Kgm¨vPi সহায়তায় এবং নিজস্ব Kgm¨vPi আলোকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে সারিবদ্ধ বনায়ন সৃজন করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে থানা বনায়ন ও নার্সারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় জনসাধারণকে m¤ú³ করে সারিবদ্ধ বনায়ন পদ্ধতিতে বাগান সৃজন Kgm¨vP চালু আছে। সারিবদ্ধ বনায়নের প্রচলিত তিনটি মডেল হলো-

মডেল– ১. বড় সড়ক, রেল ও বাঁধ বনায়ন

মডেল– ২. সংযোগ সড়ক ও গ্রামীণ iv¯Ív বনায়ন

মডেল– ৩. মহাসড়ক ও উঁচু রেলপথ বনায়ন

মডেল– ১-এর বর্ননা

১। সড়ক/বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. নিচে অড়হরের সারি থাকবে।

২। অড়হরের সারি থেকে ৩০ সে.মি. নিচে গাছের প্রথম সারি যাতে ২ মিটার ব্যবধানে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।

৩। প্রথম সারি হতে ১.৫-২.৫ মিটার `‡i (ঢালের প্রস্থ অনুসারে) গাছের দ্বিতীয় সারি যাতে ২ মিটার ব্যবধানে গাছ লাগাতে হয়।

৪। সড়ক/বাঁধের ঢালের একেবারে নিচের প্রান্তে থাকবে ZaÂvi সারি।

৫। সড়ক/বাঁধের ঢালের প্রশস্ততা ৩ মিটারের বেশি হলে ১.৫-২.৫ মিটার ব্যবধানে তিন কিংবা ততোধিক সারিতে গাছ লাগানো যেতে পারে।

৬। চারা লাগানোর আগে ৩০ সে.মি. × ৩০ সে.মি. × ৩০ সে.মি. গর্ত করতে হবে। প্রত্যেক গর্তে ১ কেজি গোবর, ২৫ গ্রাম টিএসপি, ২৫ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে।

৭। এ মডেলে ১ কিলোমিটারে সর্বমোট ১৬০০ চারা লাগানো যেতে পারে।

প্রজাতি নির্বাচন

প্রথম সারিতে শোভাবর্ধনকারী ছায়া ও কাঠ উৎপাদনকারী গাছ লাগানো হয়। যেমন— মেহগনি, রেইনট্রি, শিশু, সেগুন, আম, কাঁঠাল, খেজুর, তাল ইত্যাদি। দ্বিতীয় সারিতে জ্বালানি ও খুঁটি প্রদানকারী দ্রুত বর্ধনশীল গাছ লাগানো হয়। যেমন— আকাশমনি, অর্জুন, বাবলা, শিশু, ইপিল ইপিল, রেনট্রি ইত্যাদি।

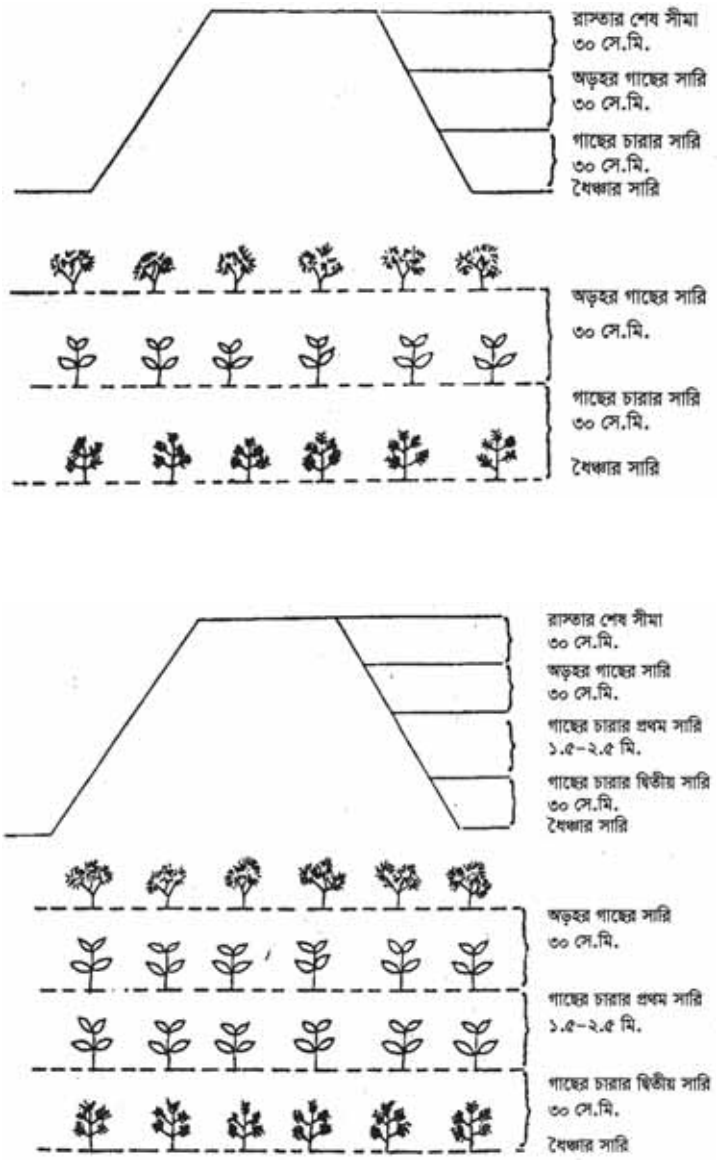

চিত্র : সড়ক ও বাঁধের ধারে এক সারিতে বৃক্ষরোপণ নকশা।

কাজ :
সড়ক ও বাঁধের ধারে দুই সারিতে বৃক্ষরোপন নকশা দলগতভাবে পোস্টার কাগজে আঁক ও উপস্থাপন কর।

পাঠ ১০ : সড়ক/বাঁধের ধার অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ।

স্থান নির্বাচন :

সড়ক ও বাঁধের ধার অথবা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও এর আশপাশের সুবিধাজনক স্থান।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, খুন্তি, শাবল, ছুরি, গোবর, রাসায়নিক সার ইত্যাদি।

২। ব্যবহারিক খাতা, পেন্সিল, কলম, রাবার, সার্পনার, স্কেল ইত্যাদি।

কাজের ধারা

১। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হলে যেখানে গাছ রোপণ করবে তার আশপাশে যদি বড় গাছ থাকে তবে ডালপালা ছেঁটে নাও। সড়ক বা বাঁধের ধারে হলে এর প্রয়োজন নেই।

২। যে গাছ রোপণ করবে তার সতেজ চারা সংগ্রহ কর।

৩। সঠিক নিয়মে প্রয়োজনীয় মাপের গর্ত কর।

৪। গর্তের মাটিতে গোবর ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে ভালোভাবে মাটি গুঁড়ো করে ১৫ দিন রোদে শুকিয়ে নেবে।

৫। মাটি আবার গর্তে ভরাট করে রাখ।

৬। চারার শিকড়ের সমপরিমাণ গর্ত কর।

৭। ছুরি দিয়ে চারাসহ পলিব্যাগের পলিথিন কেটে সরিয়ে ফেলো।

৮। মাটিসহ চারা গর্তে দিয়ে চারপাশের মাটি ভালো করে চেপে দাও।

৯। এবার পানি দাও।

১০। পরে প্রক্রিয়াটি ব্যবহারিক খাতায় লেখ। তোমার শিক্ষককে দেখাও এবং খাতায় শিক্ষকের সই নাও।

সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা

১। মাটিক্ষয় রোধ করে সড়ক ও বাঁধ রক্ষা করা।

২। পশুখাদ্য তৈরি করা।

৩। সড়ক ও বাঁধসংলগ্ন এলাকা সবুজায়ন করা।

৪। জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

৫। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬। পরিবেশে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গের আবাস সৃষ্টি করা।

৭। এলাকার পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকা ও বৃষ্টিপাতের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৮। পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

কাজ : দলগতভাবে সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয় পোস্টার তৈরি কর ও শ্রেণিতে প্রদর্শন কর।

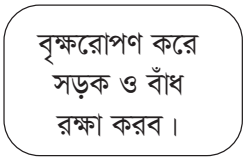

নমুনা পোস্টার-১

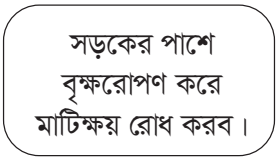

নমুনা পোস্টার-২

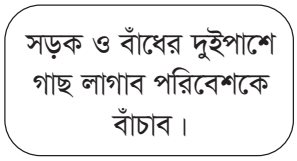

নমুনা পোস্টার-৩

অনুশীলনী

শন্যস্থান পরণ কর

১. বনায়নের ফলে f‖gi ..... ব্যবহার করা যায়।

২. উদ্ভিদের ..... তৈরির জন্য ..... উত্তম।

৩. মিশ্র বৃক্ষ চাষ এক ধরনের ..... ব্যবস্থা।

৪. সড়ক ও বাঁধের ধারে ..... ও ..... সারিতে বনায়ন করা যায়।

বামপাশের সাথে ডানপাশের শব্দ/বাক্যাংশ মিল কর

বামপাশ	ডানপাশ
১. নার্সারি হলো	পরিবেশ সমৃদ্ধ করে
২. পলিব্যাগে চারা	eû¯Í‡i বনায়ন করা ভালো
৩. কৃষি বনায়ন	চারা উৎপাদন কেন্দ্র
৪. iv¯Ívi ধারে	সহজে বহন করা যায়
	বীজ উৎপাদন কেন্দ্র

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাঁধের কিনারা থেকে ৩০ সে.মি. `‡i সারি আকারে কোন উদ্ভিদ?

ক. অড়হর খ. বৃক্ষ

গ. শস্য ঘ. ৈaÂv

২. কৃষি বনায়নের সমস্যাগুলো-

i. জনগণের অংশীদারিত্বে অনীহা

ii. প্রয়োজনীয় জমির অভাব

iii. প্রয়োজনীয় কোচের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের Ab‡"Q`wU **পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**

সুপ্তি রানী একটি এনজিওতে চাকরি করেন। তিনি গ্রামের পাকা iv¯Ívi ধারে দুই কিলোমিটারে বৃক্ষরোপণের দায়িত্ব পান। তিনি বড়পাতার বৃক্ষের পাশাপাশি অন্যান্য গাছ রোপণের পরিকল্পনা করলেন।

৩. সুপ্তি রানীর কতটি সেগুন চারা প্রয়োজন?

ক. ৮০০ খ. ১৬০০

গ. ২৪০০ ঘ. ৩২০০

৪. সুপ্তি রানীর পরিকল্পনা অন্যান্য উদ্ভিদের ওপর কী প্রভাব ফেলবে?

ক. অন্যান্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ বেশি হবে খ. ছোট ছোট উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে

গ. জমিতে ফসলের উৎপাদন কম হবে ঘ. মাটিস্থ অনুজীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১. হরিপদ সরকারের বসবাসের বাড়ির আয়তন ১ একর। তাঁর বসতবাড়ির আঙিনায় একটি পুকুর, কিছু পরিমাণ উঁচু পতিত জমি রয়েছে। কিন্তু কোনো কৃষিজমি নেই। সন্তানদের লেখাপড়া ও সাংসারিক খরচ চালাতে তিনি সমস্যায় পড়েন। অতঃপর হরিপদ দুটি গাভি ও বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষের চারা ক্রয় করে সেগুলো থেকে উৎপাদনের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করলেন।

ক. কৃষি বনায়ন কী?

খ. মিশ্র বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. হরিপদর বাড়ির আঙিনার প্রেক্ষাপটে একটি কৃষি বনায়নের নকশা বর্ণনা কর।

ঘ. হরিপদর সংসারের আর্থিক উন্নয়নে তাঁর কার্যক্রম বিশেষণ কর।

২. বরিশাল D"P বিদ্যালয়ের পাশ ঘেঁষে বড় একটি খাল বয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক খালের পাড়সংলগ্ন বিদ্যালয়ের আঙিনায় সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে বিভিন্ন জাতের গাছ রোপণ করে সামাজিক বনায়নে সফল হলো। সামাজিক বনায়নে সচেতনতা সৃষ্টিgjK বিভিন্ন পোস্টার তৈরি করে র‍্যালির উদ্যোগ গ্রহণ করল।

ক. নার্সারি কাকে বলে?

খ. গাছ কীভাবে পরিবেশকে ঠাণ্ডা রাখে? ব্যাখ্যা কর।

গ. শিক্ষার্থীদের কার্যক্রমের সফলতার কৌশল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. এলাকার জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগটি gj¨vwqb কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পলিব্যাগ নার্সারি কাকে বলে?

২. কৃষি বনায়ন কাকে বলে?

৩. সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের ধাপগুলো লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কৃষি বনায়নের গুরুত্ব লেখ।

২. পলিব্যাগে চারা তৈরির কাজের ধাপগুলো লেখ।

৩. সড়ক ও বাঁধের ধারে বৃক্ষরোপণের কৌশল বর্ণনা কর।

৪. মিশ্র বৃক্ষ চাষের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

সমাপ্ত

২০১৩
শিক্ষাবর্ষ
৮–কৃষি

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সুন্দর আচরণই পুণ্য

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :